আমাদের সমাজ।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও অবনতি, তাহার কারণ নির্দ্দেশ,
ও উন্নতির উপায়াদির বিচার সম্বলিত
সামাজিক গ্রন্থ।

শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।
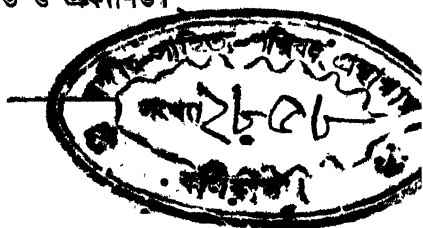
শ্রীরামপুর

১৮১৭ শক।
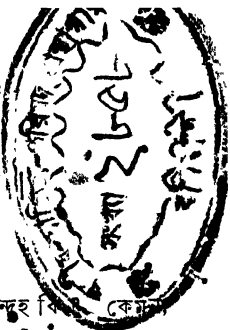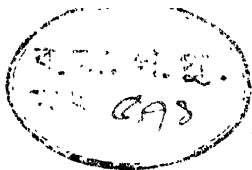
আমাদের সমাজ।

আমরা বড় লোক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেমন ঠিক না? ভাল করিয়া আপন আপন মন বুঝিয়া দেখুন দেখি; কত লোক বলিবেন, "ঠিক কথা ত।" আমিও ত তাই বলি, যে আমরা বড় লোক বটে। আমরা আর্য্যসন্তান, তাহার উপর এক্ষণে নানা বিদ্যা বিশারদ। সর্ব্বদেশীয় জনগণের আচার ব্যবহারে দোষারোপকারী বুদ্ধি প্রখরা। এত মহত্ত্ব সত্ত্বেও, কে আমাদের বড়লোক না বলিবে? আমাদের কি নাই? যোগ আছে, তন্ত্র আছে, জ্যোতিষ আছে, দর্শন আছে, বিদ্যা আছে বুদ্ধি আছে, কুটতর্ক আছে, যাহা কিছু ইউরোপ বা আমেরিক খণ্ডের নবাবিষ্কৃত দেখিয়া বিস্মিত বা স্তম্ভিত হইতেছ, সকলই আমাদের দেশে পূর্ব্বে ছিল বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি। যথার্থ থাকুক বা না থাকুক, থাকার প্রমাণ সম্বন্ধে দুই একটা সাক্ষ্যও অন্ততঃ দেওয়াইতে পারি, তবে আর নাই কি? এতদ্ভিন্ন, ম্যালেরিয়া আছে, ওলাউঠা আছে, আরও কত প্রকার আছে; এক কথায়, সবই আছে, নাই কেবল অন্ন বস্ত্র। কোনও অভাবই নাই, কেবল অন্নবস্ত্রের অভাব। তাও যে দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না বা হইত না, এমন নহে, তবে আমাদের নাই। অনন্তরত্ন প্রসবিনী ভারতে থাকিয়া আমরা দরিদ্র! প্রচুর শস্যশালিনী ভারত-সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ! শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যাদির আকর ভারত ভূমিতে বাস করিয়া আমরা উপবাসী ও উলঙ্গ।

কেন? আমাদের এ দুর্দ্দশার মূল হেতু কি? সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিবেন, যে বিদেশীয় রাজা বলিয়া আমাদের এ দুর্দ্দশা। ভাল, তাই যেন হইল; কিন্তু, এই যে প্রায় সহস্র বৎসর হইতে আমরা বিদেশীয়ের পদে লুণ্ঠিত হইতেছি, তাহার কি কোন গূঢ় কারণ নাই? পৃথিবীতে এত জাতি সত্ত্বে আমরাই যে এতদিন ধরিয়া হীনত্ব স্বীকার করিতেছি, বহুকাল ধরিয়া সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া এখনই যে এমত হইয়াছি, তাহার গূঢ় কারণ কি কিছুই নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই কারণ কে অনুসন্ধান করে? যাহার যাহা মনে আসে, সে তাহাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখায় ক্ষতি কি?

"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্।" সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। একথা ব্যক্তি বিশেষে যেমন প্রযুজ্য, জাতি বিশেষেও কেন না তেমনই হইবে? যদি একথা না স্বীকার কর, তবে জগদীশ্বরের প্রতি পক্ষপাতাদি দোষারোপ করা হয়। যাঁহারা জগদীশ্বর মানেন না, তাঁহাদিগের জন্য এ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন নাই। সে কথা, বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব, পক্ষপাত-শূন্যত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে এবিষয়ে কি তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই? যদি থাকে, তবে কেন আমাদের এত দিন এত ক্লেশ দিতেছেন, কেন আমাদের প্রতি ফিরিয়া চাহিয়াও চাহিতেছেন না? তিনি কোন্ দোষে একের প্রতি নির্দ্দয় এবং কোন্ গুণে অপরের প্রতি সদয়? এখন আমরা ইংরাজের প্রতি দোষারোপ করি,

তখন ত একবারও মনে করি না, যে ইংরাজকে তিনিই আমাদের উপর রাজা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় যাহা হয় হউক, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় ত দেখিতেছি, যে ইংরেজ আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবার যোগ্য এবং আমরা তাহাদের দাসত্ব করিবার উপযুক্ত। একথা মনে করায় অনেকের মর্ম্মভেদী কষ্ট উপস্থিত হইবে, কিন্তু কি করা যায়, বিধাতার ত এইরূপ ইচ্ছা দেখিতেছি, নচেৎ কখনই এরূপ হইত না।

ভাই! ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া মনের সহিত বলিতেছি, একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি।

যেমন আপনার দোষ দর্শন করতঃ সংশোধন করিবার চেষ্টা করা, নিজের উন্নতির উপায় এবং গৌরবের বিষয়, তেমনই জাতীয় দোষ দর্শন করতঃ সংশোধনের চেষ্টা করাতেও জাতীয় উন্নতি হয় ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। আমি কোনও মহৎ দোষে দোষী হইলে, তাহার ফলভোগ আমাকেই করিতে হইবে, অথচ অপরের নিকট নিন্দাভাজন বা ঘৃণার্হ হইব। আর সেই দোষ নিজে দেখিয়া সংশোধন করিতে পারিলে, নিজেই সুখী হইব, তৎসঙ্গে অপরেরও শ্রদ্ধাস্পদ হইব। ইহাই সাংসারিক নিয়ম। যদি অপরে আমার দোষ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলেও তৎপ্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা মূর্খের কার্য্য। বরং, সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করতঃ, যাহাতে দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। মনুষ্য যে ভ্রান্ত হইবেনা, এমন কথা কি আছে? সংস্কারগত, অথবা আপাততঃ সুখকর স্বরূপে প্রতীয়মান দোষ পরিহার করা কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কষ্ট যে সহ্য করিতে পরাঙমুখ তাহার মনুষ্যত্ব কোথায়?

জাতীয় দোষও ব্যক্তিগত দোষের ন্যায় সঙ্গ, সুবিধা, সংস্কার, অনুকরণ-প্রিয়তা, অপরিণাম দর্শিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে জন্মিয়া, ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া যায়; আর সহজে তাহা ত্যাগ করা যায় না। নিতান্ত বিষময় পরিণাম দর্শন অথবা রাজশাসন ব্যতীত সে দোষ যায়ও না। তাহাতেও কত গোলযোগ, সাধারণের কত বিরক্তি প্রকাশ, এমন কি সময়ে সময়ে রাষ্ট্র বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব, প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

তাহার প্রধান কারণ এই, যে যাঁহারা জাতিগত দোষ দর্শনে সক্ষম, এবং স্বার্থ ত্যাগ করতঃ তৎপরিহারে অগ্রসর, এরূপ প্রতিভাশালী উদার প্রকৃতি লোক সংসারে কয়জন? সাধারণে সংস্কারগত দোষ বা স্বার্থ সহজে কেন ত্যাগ করিতে চাহিবে? তাহারা কি বুঝিয়াই বা ত্যাগ করিবে? যদি তেমন কোন প্রতিভাশালী লোক জন্মাইয়া তাহা দেখাইয়া সাধারণকে মাতাইয়া তুলিতে পারেন, তবে অনেক পরিমাণে শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু অনেক সময় তাহা ঘটে না।

আমাদের দেশের অবস্থা এক্ষণে শোচনীয়। এ কথার প্রতিবাদ, বোধ হয়, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি করিবেন না। আমরা পরাধীন জাতি বলিয়াই যে আমাদের অবস্থা শোচনীয় বলিতেছি, তাহা নহে। কেবল পরাধীনতা, বিশেষ শোকের কারণ নহে। কিন্তু সেই পরাধীনতার আনুসঙ্গিক বা অন্য কারণ সমুদ্ভূত যে জাতীয় হীনাবস্থা বা ক্লেশ, তাহা অবশ্য শোচনীয়। আমাদের দেশের সেই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, এবং বোধ হয়, ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

একবার দেশের দিকে চাহিয়া দেখুন। দেখিবেন, কত

লোকের ঘরে অন্ন নাই! দেশের স্বাস্থ্য কি ছিল কি হইয়াছে! লোকের মনের স্ফূর্ত্তি কোথায় যাইতেছে! একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা কর, অকপটে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে বল, দেখ, মধ্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে শতকরা কয় জনের মনে সুখ আছে? কয়টি পরিবার যথার্থ সুখ শান্তি ভোগ করিতেছে? একবার অপরাপর জাতি সকলের প্রতি চাহিয়া দেখ, এমন কি, অসভ্য জাতির প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, আর আপনাদের অবস্থা দেখ, দেখিবে তাহারা কি, আর আমরা কি? দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; বিষাদে অবসন্ন হইয়া মনে করিবে, আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। বাস্তবিক মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

কিন্তু কেন যে আমরা এত অবসন্ন হইতেছি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হয় না? অনেকে মনে করেন, একমাত্র পরাধীনতাই ইহার কারণ। ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে আমরা জগদীশ্বরের নিকট এগুরু দণ্ডে দণ্ডিত কেন? অপরাধ ভিন্ন জগদীশ্বরের কাছে দণ্ড হয় না। অন্যে যাহা বলেন বলুন, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহার রাজ্যে অবিচার নাই। তিনি একজনকে বড় এবং চির সুখী, আর অপরকে ছোট এবং আজন্ম দুঃখী, বিনাদোষে কখনই করেন না। তাঁহাতে পক্ষপাত দোষ অথবা অজ্ঞানতাদি আরোপ করা, নাস্তিকের কার্য্য। যাঁহার অন্ততঃ কিছু মাত্র জগদীশ্বরে আস্থা আছে, তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে লোকে স্বীয় কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ, তাঁহারা একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা বা বিচার করিয়া দেখুন, যে যাঁহাকে দয়ার সাগর বলিয়া জানি, প্রতিপদে যাঁহার কৃপায় আমরা রক্ষিত, যে

বস্তু আমাদের যত প্রয়োজনীয়, সেই বস্তু যিনি তত সুলভ করিয়া দিয়াছেন, তিনি কি অনর্থক আমাদের যন্ত্রণা দিতেছেন? এক জাতি তাঁহার এমন প্রিয় কিসে হইল, যে নিয়ত সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছে, আর আমরা যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবসন্ন হইতেছি?

অবশ্য আমাদের গুরুতর অপরাধ আছে। অপরাধের দণ্ড এবং গুণের পুরস্কার তাঁহার রাজ্যের নিত্যসিদ্ধ নিয়ম। আমাদের নিকট যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বলি, এবং কেনই বা বলি? আমরা কি দোষে দোষী, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখি না কেন? যদি না দেখিতে পাই, তখন যে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারি, আর যদি দেখিতে পাই, এবং তাহা যথার্থ হয়, তবে ত সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল।

এই জাতীয় অপরাধ প্রদর্শনে, তুমি আমি সকলেই অধিকারী। অপর বিদেশীয় লোকেই বা নহে কেন? তবে, তাহা কিছু লজ্জাকর। কিন্তু আমাদের যে কষ্ট, তাহাতে আর লজ্জা স্থান পায় না। যে কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া, তন্নিবারণোপায় বলিয়া দিলে, কৃতার্থ হওয়া এবং পরম অনুগৃহীত মনে করা উচিত বোধ করি। কিন্তু আমরা সে ধাতুর লোক নহি, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? লোকে আমাদের উপকারার্থ আসিলে, তাহাকে নিন্দুক বলিয়া মারিতে যাইব। ভাগ্যে আমাদের মারিবার ক্ষমতা নাই!

সেও ত দূরের কথা! কেই বা অনুগ্রহ করিয়া, আমাদের

জন্য সে পরিশ্রম করিবে? আমাদের সমাজ, আচার, ব্যবহার, পর্য্যালোচনা করিয়া, কে বলিয়া দিবে, যে তোমাদের এই এই দোষ। অবশ্য, ভিন্নজাতীয় লোক আমাদের অপেক্ষা শীঘ্র আমাদের দোষ দেখিতে পাইবেন সন্দেহ নাই, কারণ, আমরা যে দোষে অভ্যস্ত, আমরা যাহা দোষ কি গুণ বলিয়া বুঝিতে পারিনা, তাহা অন্যের চক্ষে সহজেই বিরূপ বোধ হইতে পারে। কিন্তু কে সে পরিশ্রম বা অনুগ্রহ করিতেছে? করিলেও আমরা সে অনুগ্রহ প্রার্থী নহি, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা বড় লোক। আমাদের মনে আর্য্য সন্তানাদি বলিয়া যে গৌরব আছে, তাহাই যথেষ্ট সে গৌরব করিতে কুণ্ঠিত, লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, আমরা, তাহাকে মহত্ত্ব মনে করি। যদি কোন মহৎ বংশীয় ব্যক্তি দুরবস্থায় পড়িয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হন, তবে তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিতে সাধ্যমতে যত্ন করেন; ইতরের ন্যায়, হীন বৃত্তিস্থ থাকিয়া, পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিয়া, মূঢ়তা প্রকাশ করেন না। পরে, যখন সে গৌরবের নামমাত্রও থাকে না তখন, সেই বংশের পুরুষ-পরম্পরা, পূর্ব্ব মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া লোকের নিকট গৌরবান্বিত হইব মনে করে। আমাদেরও তদ্রূপ ঘটিয়াছে। আমরা যত অবনত হইতেছি, তত "আমরা আর্য্যবংশীয়, আমরা আর্য্যবংশীয়" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছি। আর কত দিন এ চীৎকার চলিবে? কখনও কি কার্য্যে আর্য্যবংশের পরিচয় দিবার শক্তি জগদীশ্বর দিবেন না?

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়াছি। এখন আমাদিগের জাতীয় দোষ সংস্কার করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদিগের যে দোষের জন্য আমরা অনেক কার্য্যের অনুপযুক্ত, সে দোষ

দূর করিয়া, যাহাতে যোগ্যতা লাভ করি, তাহা অগ্রে কর্ত্তব্য। প্রথমে উপযুক্ত হইয়া, পরে প্রার্থী হওয়া উচিত, এই বিদেশীয় প্রবাদ বাক্য নিতান্ত সত্য। নচেৎ বিড়ম্বনা মাত্র হয়।

আমরা কি কি দোষে কোন্ কোন্ কার্য্যের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি বা পড়িতেছি, অগ্রে তাহারই পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। ইহা গুরুতর কার্য্য সন্দেহ নাই, ইহাতে পদে পদে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। তবে, পূর্ব্বাপর জাতীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিয়ম ও অবস্থার তুলনা করিয়া, বিশেষ শান্তচিত্তে বিচার করিলে, অনেক দূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। নচেৎ, আমাদের সব ভাল, বা আমাদের সব মন্দ, এরূপ একটা ধারণা করিয়া লইয়া, তদ্বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে, তৎপ্রতি খড়্গহস্ত হওয়ায়, কোনও ফলই নাই। যদি এক জনের বিবেচনার দোষ বা ভ্রম হয়, অপরে শান্ত ও নিরপেক্ষ ভাবে প্রমাণাদি প্রয়োগ দ্বারা বিচার করতঃ, যাহা বিচক্ষণ বিজ্ঞগণের যথার্থ বলিয়া বোধ হইবে, এবং তৎসংশোধনের পক্ষে যে উপায় অবলম্বন করা তাদৃশ লোকের অভিমত বোধ হইবে, সকলে ব্যক্তিগত কষ্ট বা সামান্য অসুবিধা বা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সেই উপায় অবলম্বন করিলে, কেননা আমাদেরও জাতীয় উন্নতি হইবে? কেবল চীৎকারে, অথবা আমরা উচ্চবংসমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদানে, বর্ত্তমান কষ্ট দূর হয় না।

আমরা যাহা ছিলাম, তাহা আর নহি কেন তাহা দেখ, পূর্ব্বের আচার ব্যবহারের সহিত বর্ত্তমান আচার ব্যবহারের তুলনা করিতে হয়, কর; দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে

আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কর; বিদেশীয়ের নিকট কিছু শিখিবার থাকে, শিক্ষা কর; দেখিবে, তোমাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয় কি না? দেখিবে, তোমাদের উন্নতির পক্ষে ভগবান্ সহায় হন কি না? নচেৎ কোন্ শাস্ত্রে কে কোথায় আমাদের বর্ত্তমান সুবিধার পোষক কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া গিয়াছেন, অথবা অপরে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদির দ্বারা আপন মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল জাতীয় অধঃপতন কারক বচন সংগ্রহ করতঃ চীৎকার করিয়া দেশ ফাটাইব; চিরপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পরিবর্ত্তনের নামে উচ্চৈঃস্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিব; আমরা সর্ব্বগুণান্বিত স্থির করিয়া, বিদেশীয় গুণগ্রহণে নিতান্ত বিমুখ থাকিব, অথচ বিদেশীয় সংস্পর্শে অজ্ঞাতসারে তাহাদের দোষ, জাতি মধ্যে প্রবেশ করিলে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিব না, অথবা লক্ষ্য করিয়াও প্রতিকার করিতে অক্ষম বুঝিয়া নিরস্ত থাকিব, এরূপ করিলে অধঃপতন হইবেই হইবে। এবং সেই অধঃপতনের যে সকল বিষময় ফল, তাহাও ভোগ করিতেই হইবে।

এস্থলে, আমাদের একটি দোষের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক, যাহা থাকিলে আমরা কিছুতেই কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। দোষটী বিষম গুরুতর, এবং বর্ত্তমান অবস্থায়, সে দোষের সংশোধন হওয়াও নিতান্ত দুরূহ। অথচ তৎপ্রতিকার করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হইয়াছে। নতুবা সকল শ্রমই পণ্ড হইবে।

সে দোষ এই, যে আমরা এখনও কোন কার্য্য এক হইয়া করিতে পারি না, বা শিখি নাই।

এই দোষটি ভাল করিয়া বুঝাইতে গেলে, বিদেশীয় রীতির উল্লেখ করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য সভ্যজাতির একটি রীতি আছে, যে কোনও বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, যথোপযুক্ত সভায় তৎপ্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয়। যদি প্রস্তাব সভাস্থ সকলের অভিমত হয়, ভালই; কিন্তু কোন্ কালে কোন্ দেশে কোন্ বিষয় সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়াছে? অবস্থা বা প্রকৃতি ভেদে মত ভেদ, সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়, পাশ্চাত্য সভা সকল সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করেন। যাহা অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদিত হয়, ভাল হউক বা মন্দ হউক, সমস্ত সভ্যগণ তদ্দণ্ডে তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন, এবং অকাতরে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি কার্য্য নিতান্ত গর্হিত হয়, পরে সেই সভার দ্বারাই তৎসংশোধনের চেষ্টা হইবে, কিন্তু যখন যাহা সভায় সিদ্ধান্ত হইবে, তদনুষ্ঠানে কেহ পরাঙ্‌মুখ হইবেন না। তাহাতে পরাঙ্‌মুখ হওয়া, তাঁহারা নিতান্ত হীনতার পরিচয় প্রদান করা মনে করেন।

আমরাও এক্ষণে দেখা দেখি সভা করিতে শিখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার কার্য্য কি প্রণালীতে হইয়া থাকে? অবশ্য, যে সকল সভায় রাজকীয় সংশ্রব আছে, সে সকল সভার কথা বলিতেছি না; সে সকল পাশ্চাত্য প্রণালীতেই হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল সভা কেবল দেশীয়ের দ্বারা পরিচালিত, এরূপ অনেকানেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সভা, মধ্যে মধ্যে জন্মে ও প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। অনেক সময় কোনও বিশেষ কার্য্যবশতঃও সভা সংগঠিত হয়। তথায়, যদি কোন প্রস্তাব কেহ উত্থাপন করেন, এবং তাহাতে মতভেদের গুরুতর কারণ থাকে, তবে

র সে সভা রক্ষা হওয়া দায়। যদি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, ব প্রস্তাবকারীগণ, এবং গ্রাহ্য হইলে আপত্তিকারীগণ, ার সহিত সংশ্রব তখনই ত্যাগ করিবেন। কেবল তাহাই , যাহাতে সভাটি উঠিয়া যায়, অথবা কার্য্য বিশেষের জন্য ল, তৎপক্ষে ব্যাঘাত হয়, সে চেষ্টা বিধিমতে করিবেন। কল্পিত কথা নহে। অনেক গুলি প্রকৃত ঘটনা দেখিয়া াকের এইরূপ ধারণা। বোধ হয়; কেহই একথা অস্বীকার ন না।

পক্ষান্তরে, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনাগেল, যে একটি চিকিৎসা সমিতির প্রধান প্রধান লোক, কোন এক প্রস্তাব করেন। সভা যাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত, যাঁহাদের ব্যয়ে পরিচালিত, এরূপ বিজ্ঞ কয়েক জন চিকিৎসক সেই প্রস্তাব করেন। সভার নামে মাত্র সভ্য নূতন চিকিৎসক সম্প্রদায় তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহাদের সংখ্যা বিস্তর, এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রাধান্য; নচেৎ তাঁহারা কেহই নহেন, এবং তাঁহাদের আপত্তিও যুক্তিযুক্ত ছিল না। অথচ তাঁহারা জয়ী হইলেন। প্রধানেরা তাঁহাদের আপত্তি স্বীকার করিয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া অক্ষুণ্ণচিত্তে পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে লাগিলেন। বলুন দেখি, আমাদের দেশ হইলে কি হয়? যাঁহারা সভার অস্থি ও মজ্জা, বিশেষতঃ বড় লোক, তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই অপর পক্ষ অপমানিত হইয়া, নূতন এক সভা স্থাপনের চেষ্টা করেন। কেবল এই একটি ঘটনা নহে, সর্ব্বত্রই এই নিয়মে কার্য্য হয়। আমেরিকা খণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের সভাতেও অবিকল ঐরূপ নিয়মে কার্য্য

হইয়া থাকে। সে সকল অতি অদ্ভুত কাহিনী। তাই বলি, যে যদি আমরা এক যোগে কোনও কার্য্য না করিতে পারি, যদি সাধারণের অভিমতের বিরুদ্ধে আত্মমত হইলে, তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে না পারি, তবে আর জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? এক পরিবারের মধ্যে সকলে মিলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে, যেমন প্রধানের স্বার্থত্যাগ, পক্ষপাতশূন্যতা, সহিষ্ণুতা,—নিতান্ত অনুসঙ্গত না হইলে—সাধারণের অভিমতের অনুমোদন, অর্থচ অসঙ্গত ব্যবহারের দমন প্রভৃতি বিচক্ষণতা; এবং অধীনস্থ পরিবারবর্গের, নির্ব্বিচারে প্রধানের আজ্ঞাপালন, পরস্পরের প্রতি সমভাব এবং কলহ ত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রয়োজন, সমাজ সুশৃঙ্খলে রাখিতে গেলেও অবিকল ঐরূপ প্রধানের স্বার্থত্যাগাদি, এবং অধীনস্থদিগকে বশ্যতা স্বীকার, আজ্ঞাপালন প্রভৃতি সদ্‌গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সভাপ্রভৃতিতে অধিকাংশের মত প্রধানের গ্রাহ্য এবং অপরাপর সকলের, প্রধানের আজ্ঞাবর্ত্তী হওয়া উচিত।

সাধারণ তন্ত্রই হউক, আর রাজ শাসন তন্ত্রই হউক, পৃথিবীর যাবদীয় রাজ্যও এই নিয়মে শাসিত হইয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রমে রাজ্য অরাজক, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি উপস্থিত হয়। আমাদের সমাজে এই বিপ্লব নিশ্চয়ই উপস্থিত।

আমরা বিদেশীয়দিগের গুণে অন্ধ থাকিয়া, প্রায় দোষ দেখিয়া থাকি; সুতরাং, এসকল বিদেশীয়ের গুণ বর্ণনা স্থলে বলিতে হয়, যে আমরা জাতীয় উন্নতির জন্য, জাতীয় দোষ দর্শনেই অধিকারী। বিদেশীয়ের সহস্র দোষ থাকিলেও আমাদের তাহা দর্শাইবার প্রয়োজন কি? সে দোষ আমাদের

মধ্যে প্রবেশ না করিলেই হইল। অবশ্য, অপর কর্ত্তৃক আমাদের অনিষ্ট হইলে, তন্নিবারণ চেষ্টা স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্য, কিন্তু বিদেশীয়দের গুণে অন্ধ থাকিয়া তাহাদের ছিদ্র অন্বেষণ করা যেমন হীনত্বের পরিচায়ক ও অধঃপতনের মূল; বোধ হয়, জাতীয় দোষে অন্ধ থাকিয়া গুণকীর্ত্তনে রত থাকাও তদ্রূপ।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের আর আর মহৎ দোষ কি? আমরা প্রভুত্বের গৌরব রক্ষা করিতে পারিনা, এবং তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহারও জানি না। বোধ হয়, সেই জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভুত্ব দেন নাই। যাঁহার কিছু প্রভুত্ব জন্মিযাছে, প্রায়ই দেখা যায়, তিনি স্বেচ্ছাচারী হইবা উঠিয়াছেন, এবং ক্রমে স্বার্থপরতাদি দোষে তাহার যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়া থাকেন।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, কিছু দিন পূর্ব্বে দেশের জমীদারেরা প্রজার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? প্রজার জরু গরু জমীদারের অথবা তাঁহার কর্ম্মচারিদের ভোগ্য সম্পত্তি স্বরূপে গণ্য ছিল। প্রজার ঘরে প্রকৃতই অন্ন ছিল না; তখনকার সুলভ বাজারেও, ঋণে প্রজার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত বিক্রীত থাকিত। কত বাবে যে প্রজার অর্থ শোষিত হইত, তাহা সংক্ষেপে কি বলিব? স্থূলকথা, তাঁহাদের কিছুই ছিল না, সমস্তই জমীদারের, এমন কি, তাহাদের গৃহে জাত লাউ, শশা কি ছাগশিশু পর্য্যন্ত জমীদার বা তাঁহার কর্ম্মচারির ভোগ্য হইত। আবার আমরাই না ইংরেজ রাজকর্ম্মচারি-দিগকে শোষক বা অত্যাচারী বলিয়া থাকি? বলিতে কি,

যথার্থ কথা অনেকের অপ্রিয় বোধ হইবে, হয় হউক, সেই ইংরাজের গুণেই, স্বতঃ বা পরতঃ, এখন প্রজাগণ সুখী। স্বতঃ বা পরতঃ বলি এই জন্য, যে ইংরাজ আইনে সে দোষ অধিকাংশ প্রশমিত করিয়াছে, এবং যাহা আইনে পারিত না, বা অনেক স্থলে পারে নাই, অনেক জমিদার এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার গুণে, অতি প্রসংশনীয় ভাবে প্রজা পালন করিয়া থাকেন। এরূপ হইতে পারে, যে কচিৎ কোথাও কোন ইংরাজী অনভিজ্ঞ জমীদারেও প্রজার প্রতি সদয়, কিন্তু তাহাদের মনে ইংরাজী শিক্ষার আভাস ব্যতীত কখনও এরূপ ঘটিত না, তাহা নিশ্চয়। কই পূর্ব্বে ত এরূপ কোথাও ছিল না। এখন প্রজার ঘরে অন্ন আছে, তাহারা দুবেলা খাইতে পায়, চাকুরিয়া কেরাণী ও অনেক মধ্যবিত্ত লোকের অপেক্ষা তাহারা এখন প্রকৃতই সুখী।

এ ত গেল বাহিরের প্রভুত্বের কথা। ঘরের ভিতর দেখ দেখি, যে স্ত্রী জাতি পুরুষের অর্দ্ধ অঙ্গ স্বরূপা, সমাজের অর্দ্ধেক, আমাদের মাতা, পত্নী, ভগিনী এবং দুহিতা, তাহাদের প্রতি এক স্বার্থপরতার জন্য কি অত্যাচারই না করিতেছি? এবিষয়ে অনেক গুলি কথা লিখিতে হইতেছে, কারণ, এটি অতি গুরুতর বিষয়। এ বিষয় সবিস্তারে না লিখিলে এ পুস্তক লেখাই বৃথা। একে একে সকল গুলি আলোচনা করিয়া দেখ দেখি? স্বার্থের মোহ ত্যাগ করিয়া দেখ, প্রত্যক্ষ দেখিবে, নচেৎ কোন কথাই ভাল লাগিবে না।

আমরা আজন্ম স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকি। একে একে দেখুন। প্রসূতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত। কি সন্তান জন্মে দেখিবার জন্য সকলে সমুৎসুক। যদি পুত্র জন্মিল,

পুরবাসীগণের কতই আনন্দ! পিতার আনন্দ, মাতার আনন্দ, প্রতিবেশীর আনন্দ, আনন্দের আর সীমা নাই! আর যদি কন্যা হইল! পৃথিবী অমনি দশ হাত নামিয়া পড়িলেন। আনন্দের উৎসব দূরে থাকুক, অনেক স্থলে বিষাদের চিহ্ন দেখা দেয়। যিনি পুত্র হইলে শংখধ্বনি করিবার জন্য শংখ হস্তে বসিয়াছিলেন, তিনি শংখ লুকাইলেন। হয়ত, স্নেহময়ী প্রসূতীর পর্য্যন্ত চক্ষে জল আসিল। কি ঘোরতর বৈষম্য! উভয়েই ত সন্তান, সমান স্নেহের সামগ্রী! তবে এভাব কেন? পরের ঘরে যাইবে বলিয়া? না আর অনেক কারণ আছে! সেই কারণ, ভাবী অত্যাচার। তা যতই কারণ থাকুকনা কেন? সকলেরই ত মূল আমরাই! গর্ভ সঞ্চার হইবামাত্র যদি জানা যাইত, যে এ গর্ভে নিশ্চয় কন্যাসন্তান হইবে, তাহা হইলে, বোধ হয়, দশ মাস গর্ভভার বহন কবিতে কেহই সমর্থ হইত না। এ কন্যা কেনই যে জগদীশ্বর আমাদের ঘরে প্রেরণ করেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। ভারতে কন্যা সন্তান আদৌ না জন্মিলে, বোধ হয়, অচিরেই ভারতের চরমোৎকর্ষ লাভ হয়।

তাহার পর কন্যার প্রতিপালন। অতি অল্প স্থল ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিবে, যে কন্যাই পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন অঙ্গ। মরিলে, একটা মেয়ে মরেছে। আর পুত্র মরিলে পুত্রশোক উপস্থিত। জনক জননীরও যে সন্তানের প্রতি এতাদৃশ বিষম দৃষ্টি, ইহাই আশ্চর্য্য। ভারতবাসীরাও কি জগদীশ্বরের কন্যা সন্তান নাকি? হইতেও পারে, এ জাতির পৌরুষ ত কিছুই দেখা যায় না।

সেকথা থাকুক, তাহার পর দেখুন, আহার, পরিচ্ছদ, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই পুত্র ও কন্যার প্রভেদ। পুত্র যাহা খাইবে, কন্যা তাহা সমান রূপে কখনই পাইতে পারেনা। বিষয় আশয় না দেও নাই দিলে, না দিবার হেতুও আছে, স্বীকার করি, কিন্তু শিশু সন্তান ভ্রাতার সহিত সমান খাইতে না পাইলে মনকে কিরূপে বুঝায়, যে সে ভারতে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? "তুই মেয়ে হ'য়ে ভাইদের সঙ্গে সমান চাস্?" প্রতি পদে এই মধুর বাক্য, তাহাকে অনেক ঘরেই শুনিতে হয়। হয় ত ভাই জুতা লাথি খাইয়া কেরাণী গিরি করিয়া টাকা আনিবেন, মদ খাইবেন আর বৃদ্ধা জননীকে 'দূর হ মাগী,' বলিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিবেন; আর কন্যা, বৃদ্ধ মাতাপিতার মৃত্যুকালে কাঁদিতে কাঁদিতে সেবা করিবেন।

যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা কন্যাকে অলঙ্কারাদি দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা। আপাততঃ, পুত্র কন্যার প্রভেদ দেখাইতে আর পুঁথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাই।

তাহার পর কন্যার বিবাহ। সর্ব্বনাশের সূত্রপাত। না হইলেই হয় ভাল, কিন্তু ঋষিরা কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে বড় "অন্যায় হয় লিখিয়াছেন," সুতরাং কি করা যায়? সত্বর বিধবা হইয়া হাঁড়ি ধরে, তবেইত! এ কথায় কেহ রাগ করিবেন না; কথাটা রহস্য করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছি মাত্র। কন্যার বিবাহ দিবার সময় প্রায় কেহই একথা মনে করেন না; এবং কন্যা বিধবা হইলে, কেহ যে সুখী হন, এমন কথা কখনই মনে করি না। তবে, ফলে এরূপ ঘটিলে, যে ব্যবহার সচরাচর দেখা যায়, তাহাতে মনের ভাব ঐরূপ বলিতে ইচ্ছা করে, এই পর্য্যন্ত।

সে কথা যাউক, এক্ষণে বিবাহের কথা হউক। শুভ কর্ম্মে অশুভ কথার প্রয়োজন নাই। এই বিবাহ ব্যাপারে একটি ভীষণ প্রথা ঘটিয়া উঠিয়াছে! এটি অতি অল্প দিন হইতে ঘটিয়াছে, এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা ক্রমে উন্নত হইতেছি কিনা? যে সকল সংস্ক পূর্ব্বে ছিল না, তাহাও এক্ষণে হইতেছে।

যাঁহার পুত্র, তিনি কন্যার পিতার কাছে এক প্রকাণ্ড ফর্দ্দ করিয়া পাঠাইলেন। সে ব্যক্তি কেরাণীগিরি করে; ত্রিশটি টাকা বেতন পায়, কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, পুঁজি পাটার মধ্যে পৈতৃক একটু ভিটা আছে মাত্র। পল্লীগ্রামের ব্রহ্মত্র জমী যাহা কিছু ছিল, তাহা সহরে চাকরি উপলক্ষে বহুকাল বেদখল হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কন্যাদায়ে এত টাকা কোথা পায়? বরের বাপ বলিলেন, আমার ছেলে এলে পড়ে, আর দুদিন পরেই গাছে উঠিয়া আকাশের চাঁদ পাড়িয়া আনিয়া হাতে দেবে, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়, তামাক পর্য্যন্ত খায় না (চুরুট ও একটু আধটু মদ খায়), তার উপর আমার পাকা বাড়ি আছে, উপর নীচে আট দশটা কুঠারি, বাগাত, খিড়্কী পুষ্করিণী? গৃহিনীর গায়ে এক গা গহনা; তুমি আর এমন পাত্রে (অল্প করিয়া বলি,) হাজার টাকা নগদ, পঞ্চাশ ভরি সোনা, আর উপযুক্ত দান পণ দিতে পারবে না? ওঃ আমার ছেলের কত মেয়ে জুটবে! কন্যার পিতাও দেখিলেন, যে এমন ছেলে পাওয়া ভার। রক্ষা হইল, পাঁচশত টাকা নগদ, পঁচিশ ভরি সোনা ইত্যাদি। ঘটীবাটি বন্ধক দিয়া কোন মতে টাকা সংগ্রহ করিলেন।

এদিকে বরের পিতা স্থির করিলেন, যে নগদ টাকাটা রোসনাই, ইংরাজি বাজনা ও বিবাহের অন্য খরচে ব্যয় করিবেন? আর ঐ সোনাটাত ঘরেই রহিল, আপাততঃ বৌমার পাঁচ খানি গহনা হইল, পাঁচজন দেখিবে, পরে যাহা হয় তাহা হইবে। নিশ্চয়ই হইবে। আর লিখিতে পারা যায় না। যাহার সহিত এতদূর ঘনিষ্ট কুটুম্বিতা হইল, পুত্রের শ্বশুর, যাহার সুখ দুঃখের ভাগী হওয়া উচিত, তাহাকে পথে বসাইয়া, চুনা গলির গোমিশ বাজাওয়ালা প্রভৃতিকে দিয়া এক দিনের বাহাদুরি লওয়া কি হীনতার পরিচয়! আর অধঃপতনের বাকি কি? এখনও আমরা আর্য্যসন্তান! আর্য্যরক্ত শরীরে থাকা দূরে থাকুক, সে বায়ু পর্য্যন্ত আর এদেশে বহে না। বলুন, যে এটা ইংরেজী শিক্ষার গুণ। কই, ইংরেজ ত কোথাও এ কথা শিখায় না, এটা ত সম্পূর্ণ আপনাদেরই মহত্ত্ব! পুত্রের পিতা! মনে থাকে যেন, যে তোমারও দুই তিনটি কন্যা, একখানি বই বাড়ী নয়; কন্যা না থাকে, এই পুত্রেরও ত কন্যা হইতে পারে?

অগ্রে, দেশের ভদ্র লোক সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, ধনী, এবং সামান্য লোক। যাঁহারা ধনী, তাঁহারা অকাতরে অর্থ ব্যয়াদি করিতে পারিতেন, সামান্য লোকের তাহাতে অনুকরণেচ্ছা বড় জন্মিত না। কোথাও যাত্রা হইল, ধনীগণ অকাতরে প্যালা দিতে লাগিলেন, সামান্য লোকে কিছু না দিয়াও শুনিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যাত্রাওয়ালাদের বড় একটা বায়নার প্রতি লক্ষ্য ছিল না, ভাল যাত্রা হইলে প্যালায় পোষাইয়া লইত। বিবাহাদিতে ধনী যে সকল অপব্যয়

করিতেন, সামান্য লোকের সে দিকে দৃষ্টিই ছিল না। এক্ষণে, ইংরাজ-রাজ্য গুণে, এবং দায়ভাগাদি অনুসারে বিষয় বিভাগাদি হওয়ায়, ধনী শ্রেণী প্রায় ভাঙ্গিয়া, এবং সামান্য শ্রেণীর লোকে, শিক্ষা ও উপার্জ্জনাদি গুণে, ভগ্ন ধনী শ্রেণীর সমকক্ষ হওয়ায়, একটি মধ্য শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চাহেন না, অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা ভাল নহে। বলিতে কি, মধ্যশ্রেণীর অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত যাত্রার উদাহরণেই দেখুন, এখন তাঁহারা ধনীর সঙ্গে একত্রে বসিয়া, নিজেও কিছু না দিয়া শুনিতে লজ্জা বোধ করেন, অথচ দিবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই। সুতরাং যাত্রা শুনা হয় না। শ্রোতার অভাবাদি হইয়া পড়ায়, অগত্যা ক্রমে যাত্রায় প্যালা দেওয়া প্রথা বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। তা হোক, ভালই হইয়াছে; কিন্তু বিবাহে যে ধনাগণ রোসনাই, বাজি, বাজনা প্রভৃতিতে বিস্তর অর্থ অনায়াসে ব্যয় করিতেন, মধ্যবিত্তগণ তা পারেন কই? অথচ সে চেষ্টা করেন, বা ইচ্ছা করেন, এইটিই না মূর্খতা? যিনি অনেক কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তিনিও পুত্রের বিবাহে একদল ইংরাজি বাজানা ও গোটাগত থাসগেলাস করিবেন! কোথা হইতে হয়? ব্রিটিস্ রাজ্যে চুরি ডাকাতি প্রকাশ্যে করা সহজ কথা নয়। তবে টাকা আসিবার উপায়? ভাঁড় যেটা কন্যাদায়গ্রস্তের ঘাড়। অতি সহজ কথা। এখন সে বেচারা যে পায় কোথায়, তাহার বিচার নাই! এক একবার বলে [illegible] কন্যা কর্ত্তারা ধর্ম্মঘট করিয়া বলেন, যে, যে ব্যক্তি পুত্রের বিবাহে

টাকা চাহিবে, তাহাকে কন্যা দিবেন না, ত ঠিক হয়। জানিয়া শুনিয়া কেমন ভদ্র ঘরে কন্যা দান! তার পর, ছেলে ধাড়ি হয়ে যখন দড়ি ছিঁড়িবে, তখনই ঠিক হইবে। তা এসব ধর্ম্মঘট কি আমাদের দেশে হইবার? আমাদের দেশে দলাদলি হয়, লুকোচুরি হয় ইত্যাদি। ধর্ম্মঘট গাড়োয়ানে করে, দাঁড়ি, মাঝি, মুটে প্রভৃতিতে করে। সে কথা থাক।

তার পর, বিবাহ ত হইয়া গেল, কন্যা শ্বশুরালয়ে গেলেন, খুব আদরের বৌমা, বড় ছেলের বৌ, ঘরের লক্ষ্মী, সর্ব্বময়ী, এ সংসার তোমার, ইত্যাদি নানারূপ আদরের স্রোত চলিল। 'দেখি মা কেমন গয়না তোমার বাপ্ দিয়েছে? আ-মর মিন্‌সে, পেতল দিয়েছে নাকি গা? তাও আবার পানে ভরা। তা তোমার বাপ্‌কে এ গুলো ভেঙ্গে একটু বড় ক'রে গড়িয়ে দিতে ব'লো। বৌমার চক্ষুস্থির, ক্রমে স্থুর উঠ্‌লো, মিন্‌সে বাসন দিয়েছে দেখ? সুর চড়ে বাপ্‌কে ছেড়ে বৌমাতে এলো। 'বৌটা কুঁজড়ো, ঝগড়াটে, এর মধ্যে সোয়ামীর কাছে লাগাতে শিখেছে। ইত্যাকার নানা কাহিনী, না হয় এমন ঘরই দেখা যায় না। বৌজীবন যেন পৃথিবীতে কখনও কাহারও না ঘটে। শ্বাশুড়ী, যেন তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব ব্যবহার অবিকল স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন, ননন্দ্, যেন তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্বশুরালয়ের ব্যবহার কিছুমাত্র ভুলেন নাই, সেই শোধ যেন ভ্রাতৃজায়ার প্রতি তুলিয়া লইবেন, সংকল্প করিয়াছেন। অনেক স্থলে, পশুর প্রতি অপেক্ষাকৃত সদ্ব্যবহার হয়। এ ব্যবহারের অন্যথা যে হয় না, এমত কথা বলিনা, কিন্তু তাহা এত বিরল, যে ধর্ত্তব্যই নহে। মনে করুন দেখি, পুত্রের শ্বাশুড়ী ও কন্যার শ্বাশুড়ী, সমার

পদ বাচ্য হইলেও, কত প্রভেদ ! এক পক্ষে জামাতার প্রতি ব্যবহার, পক্ষান্তরে পুত্রবধূর প্রতি ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে, কি বৈষম্যের কথাই মনে হয় !

এ ত গেল শ্বাশুড়ীর কথা, তাহার পর স্বামী; যদি ভাল হইলেন, তবেই কতক রক্ষা, নচেৎ আরও চমৎকার ব্যাপার হইয়া উঠিল। এরূপ সকল স্থলে প্রায়ই উদ্বন্ধনাদি; অথবা অন্যরূপ ঘটনা হইতে শুনা যায়। আর, স্বামী স্ত্রীর বাধ্য হইলেও বিষম বিপদ। স্বামীর কিছু করিতে পারুক না পারুক, প্রাণ যায় বধূর। স্বামী পরাধীন হইলে, তাঁহাকেও অনেক সহ্য করিতে হয়। যিনি বিদেশে কর্ম্ম কবেন, তিনি স্ত্রীর বধূ অবস্থায় কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার নাম করিতে পারিবেন না। করিলে, সে বড় দোষেব কথা, সেখানে গিয়া যাহা ইচ্ছা কর, পুরুষের তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু স্ত্রী সঙ্গে লইয়া যাওয়া অপেক্ষা কাপুরুষের কার্য্য আর নাই।

আদিপুরাণ রামায়ণ না এদেশের শাস্ত্র স্বরূপে আদরণীয়? রাম চরিত্র না আমাদের আদর্শ চরিত্র? যখন রাম বনে গমন করেন, তখন সীতা বলিলেন, আমি তোমার সঙ্গে বনে যাইব। স্বামীর সঙ্গে থাকা স্ত্রীর অধিকার, আমি সে অধিকার কখনই ত্যাগ করিবনা। কই, তখন ত তাঁহার শ্বশুর, অযোধ্যার রাজা দশরথ, শ্বাশুড়ী কৌশল্যা প্রভৃতি, একথা বলিয়া রাখিতে পারিলেন না,-যে "সে কি মা,তুমি রাজার বৌ, কোথা যাইবে? বিশেষ বনে যাওয়া, তা কি হয়?" তখন তাঁহাদের পুত্রবধূকে স্বীয় অধিকারচ্যুত করিতে ও মনে করিলেই পারিতেন। আর যে রাম পিতৃ আজ্ঞায় বনে যাইতেছেন, তিনিও যে অন্যায়

হইতেন, এমত ত বোধ হয় না। অযোধ্যা কাণ্ডের ২৭ হইতে ৩০ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠকরিয়া দেখিবেন, বন গমন সম্বন্ধে যখন রামচন্দ্রের সহিত সীতার কথোপকথন হয়, তখন সীতার বনগমন সম্বন্ধে রামচন্দ্রও পিতামাতার অভিমতের কথা পর্য্যন্ত একবারও উত্থাপন করেন নাই, এবং সীতাও অপরের নিকট এ বিষয়ে কোনও কথাও কহেন নাই। রাম পিতৃ আজ্ঞায় ত বনে যাইতেছেন, কিন্তু কই সীতাকে ত পিতার অনুমতি সাপেক্ষ, ঐ কথা একবারও বলেন নাই। স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া অভিমত দিলেন। এ সময় রাম বিলাতে ইংরাজি রীতি শিখিয়া আসিয়াছিলেন নাকি? ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেন না, তাঁহারাও রাজ্যাধিপ ছিলেন। এখন এপক্ষেও অধিকারচ্যুত, ওপক্ষেও তাহাই। এখন আফিসে মনিবের কাছে লাথি খাইয়া বাটীতে আসিয়াই ক্রোধভরে স্ত্রীর পৃষ্ঠে পদাঘাত। জাননা, যে এই পদাঘাতের প্রতিশোধ দিবার জন্যই ভগবান ইংরেজকে বুট পরাইয়াছেন? তুমি ভাই কেরাণী, জুতা খাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাটী আসিয়া দেখিলে, যে একজন, ইংরেজকে খুব গালি দিয়া লিখিয়াছে। ভারি আনন্দ! খুব লিখেছে! লিখেছে ত বটে, কিন্তু কাল যদি একথা তোমার মনিব সাহেবের কানে উঠে, তবে তোমার দশা কি হইবে? তাই বলি, ও আনন্দ ছাড়িয়া দেও, যাহাতে প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে পার, সে চেষ্টা পাও। ঘরের বৈষম্য দূর করিতে গেলে যে অসুবিধা টুকু সহ্য করিতে হয়, তাহা পার না, আর যখন প্রহারের চোটে পৃষ্ঠদণ্ড ভাঙ্গে প্লীহা ফাটে, তখন ত বেশ সহিষ্ণুতার পরিচয় দেও!

আব এরূপ লেখক দিগকেও বলি, যে এরূপ কৃষ্ণেব জীব দিগকে নাচাইয়া, লেখার কাটতি বাড়ানতে বিশেষ মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। তুমি ত চীৎকার করিয়া গর্ত্তে ঢুকিলে, আর তোমার ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতি, কুটুম্বের দশা কি করিলে? কাল আবার না হয় যথাসময়ে চীৎকাব কবিবে। কিন্তু কিছু কবিতে পারিবে কি? তোমার কোনও অত্যাচার দেখিয়া, যদি তোমার প্রজা অথচ ভৃত্য, একাধারে দুই পদ প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি তোমাকে অসম্বন্ধ গালি দেয়, তুমি কি তাহা সহ্য কর? আপনার গায়ে হাত দিয়া কথা কওনা ভাই! যাহা শিক্ষা দিলে যথার্থ উপকার হইবে, আমাদের দেশে এরূপ শিক্ষা দিবাব বিষয় অনেক আছে, তাহা ছাড়িয়া, যে বিবাদে সর্ব্বতোভাবে আমাদেরই অনিষ্ট, সে বিবাদ বাড়াইবার চেষ্টা পাও কেন? যদি তাহাতে কোনও স্বার্থ থাকে, এ উপায়ে তাহা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইও না, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

কথায় কথায় অনেক বাজে কথা কহিয়া ফেলিলাম। মনে করি, এ সকল কথা কহিয়া অসন্তোষের পাত্র হইব না, কিন্তু কেমন স্বভাব, না কহিয়া থাকিতে পারি না।

আমরা প্রভুত্বের অপব্যবহার করিয়া থাকি, সেই কথা হইতেছিল। যে প্রভুত্বের গৌরব রক্ষার জন্য রাজা রাম চন্দ্র সীতা সমা পত্নীকে কলুষস্পর্শ শূন্যা জানিয়াও বনে দিয়াছিলেন, সেরূপ প্রভুত্বের কিছুমাত্র আমাদের মধ্যে নাই, থাকিবার আশাও করিনা; তবে যেখানে যেটুকু আছে, তা অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা স্ত্রীর উপরেই থাকুক, আর কন্যা পুত্রের

উপরেই থাকুক, বৃদ্ধ পিতামাতার উপরেই থাকুক, বা দুষর দশঘর প্রজার উপরেই থাকুক, অথবা রাজ কর্ম্মচারিত্ব পদ উপলক্ষে কয়েকজন স্বদেশীয়ের উপরেই থাকুক, তাহার অপব্যবহার করিতে অনেকেই ক্রুটী করেন না।

স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর যে কি ভাব হওয়া উচিত, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাহাতে স্ত্রীজাতির বিশেষ অপরাধ কি? তাহারা অশিক্ষিতা, অন্তঃপুরচারিণী, না শিখাইলে কেমন করিয়া জানিবে? যে জাতি স্ত্রীর গৌরব জানে না, সে জাতি স্ত্রীকে শিখাইবেই বা কি? এখানে অন্য জাতির কথা কহা হইবেনা, অন্য জাতির প্রতি এ সম্বন্ধে আমাদের একপ্রকার বিষম ধারণা আছে, সে কথায় কাজ নাই। আমাদের দেশেরই চরম উন্নতির সময় মহাভারতকার কি বলিয়াছেন? "অর্দ্ধংভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা। ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তারিষ্যতঃ॥" কতদূর গৌরবের কথা দেখ দেখি? ভার্য্যা অর্দ্ধাঙ্গ এবং শ্রেষ্ঠ সখা ত জানি, তাহার অপেক্ষা কত উচ্চকথা যে ভার্য্যা ধর্ম্মার্থ কাম, এই ত্রিবর্গের এবং পরিত্রাণেরও মূল। আরও কত কথা আছে কত লিখিব? এ চক্ষে স্ত্রীলোককে দেখিলে আর ভাবনা কি? তাহা না দেখার ফল কি জান? যাহা হাতে হাতে দেখিতেছ, শাস্ত্রেও তাহাই বলে, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু নপূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ। শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং। নশোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বথা।" যে কুলে ইঁহাদের পূজা নাই, সে কুল যায়, আমাদের দেশে ইঁহাদের পূজা নাই, তাই দেশেরও এ দুর্দ্দশা। ইঁহাদের পূজার

দেবতারা তুষ্ট, যেখানে ইঁহাদের পূজা নাই, তথায় সমস্ত ক্রিয়া বিফল, ইঁহাদের কষ্টে অচিরে কুল নষ্ট হয়, নতুবা কুল সংবর্দ্ধিত হয়।

ইহার পর বহুবিবাহ! একপক্ষে পতি মরিলেও বিবাহের ব্যবস্থা নাই, পক্ষান্তরে পত্নী সত্ত্বেও এক, দুই, তিন, যত ইচ্ছা বিবাহ করনা কেন, কোনও আপত্তি নাই। ইহা যে কিরূপ সমাজ সুশৃঙ্খলে রাখা, তাহা ত বুঝিলাম না। অসভ্য অবস্থায় অনেকরূপ চলিতে পারে বটে, কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি বিলুপ্ত হইলে ভাল হয় না? আর ব্যভিচার কাহাকে বলে? কেবল পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই বিবাহ না কি? ইহাতে কি কোনও স্বর্গীয় পদার্থ নাই? যদি থাকে, তবে তাহা যুগপৎ দুই বা বহু পত্নীতে কিরূপে সম্ভবে? সে প্রেম, সে প্রণয়, কি জঘন্য বলিয়া বোধ হয় না? যে ভালবাসা এক জনকে দিতে কুলায় না, সমস্ত দিয়াও যেন তৃপ্তি হইল না বোধ হয়, তাহাতে আবার অংশ? তাহার মধ্যে চুরি? তবে আর তাহার পবিত্রতা থাকে কই? স্ত্রীকে উপেক্ষা করতঃ পরদারও যেরূপ, বহুবিবাহও সেপক্ষে তাহাই। যাহার হৃদয়ে পবিত্র প্রণয়ের, নির্ম্মল দাম্পত্য প্রেমের অপার্থিব মধুর ভাব নাই, সে হৃদয় মরুভূমি, শ্মশান, অথবা নরক তুল্য। পশুহৃদয়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদই বা কি? মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদন জন্য বিবাহ, এরূপ বিবাহে তাহা কিরূপে সাধিত হয়? বিবাহের সময় কি বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হও? সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াও ত মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, শঠ হইতে হয়? যে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত প্রবঞ্চনা করিতে পারে,

তাহাকে বিশ্বাস কি? সে কি না করিতে পারে? সে বেশ্যার সঙ্গে সমান। যাঁহারা, বিধবা বিবাহ দিলে, দেশের লোক বৃদ্ধির আশঙ্কা করেন, তাঁহারা বহু বিবাহে লোক বৃদ্ধির আশঙ্কা করেন না কি? না, এরূপ মনে করেন, যে এক ব্যক্তি তিন শত বিবাহ করিয়া লোকান্তর গমন করিলে, একেবারে তিন শত বিধবা হইবে, সুতরাং লোক বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হইবে! এ সকল প্রথা প্রচলিত রাখার জন্য আবার তর্ক, যুক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি করায় যথেষ্ট সুশিক্ষা, সুরুচি এবং উন্নত চিত্তের পরিচয় দেওয়া হয় বটে।

আমরা বধূ জীবনের কথা সমাপন করিয়া একবার বিধবার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলি। এ বিষয়ে অধিক বলিবার আর কি আছে? স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অনেক মহাত্মা অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। কবিবর হেম বাবুও জ্বলন্ত অক্ষরে অনেক অভিসম্পাত দিয়াছেন। কিন্তু শোনে কে? তাহার মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম কয় জন আছে? থাকিলে, দেশের দুর্দ্দশা এমন? যখন চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, তখন আমার ন্যায় খদ্যোত কে? তবু দুই একটা কথা বলিতে হয়, বলি। মন বুঝে না। (ভারত কামিনী, বিধবা রমণী, কুলীন মহিলাবিলাপ, প্রভৃতি শীর্ষক প্রস্তাব, হেমবাবুরকৃত কবিতাবলীতে যিনি না পড়িয়াছেন, তিনি একবার পাঠ করিয়া দেখেন, এই অনুরোধ।) ভাল, এ কথাটা কি একবার কাহারও মনে আসে না, যে, এই যে সমস্ত ব্রহ্মদর্শী পণ্ডিতগণ আমাদের জন্য এত করিয়া চীৎকার করিয়া মরেন, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ কি স্বার্থ? যে কেহ দেশের মধ্যে বিজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ তাঁহারাই এই

সকল কথা বলেন, অথচ আমরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, গালি দিতে ছাড়িনা, এবং ক্রমে তাঁহাদিগকে বিষনয়নে দেখিতে আরম্ভ করি, কোথায় তাঁহাদের গৌরব করিব, না তাঁহাদের অনিষ্ট চেষ্টাই করি। বাহবা রে আমরা! তাঁহারা পড়িয়া শুনিয়া, শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া, কিছু জানেন না; আর আমরা, না পড়িয়াই পণ্ডিত? আমরা আমাদের কষ্ট দূর হইতে দিব না, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া করিবেন কি?

বিধবার পক্ষে সহমরণ ব্যবস্থা। বেশ কথা; পুরুষের বেলাও নয় কেন? এ বৈষম্যের কোনও কারণই ত নাই; কি ভয়ঙ্কর কথা? স্বামী মরিলে স্ত্রীকেও মরিতে হইবে! জগদীশ্বরের এ ভ্রম সংশোধন করিতে আমাদের জাতিই ভাল শিখিয়াছে। তাঁহার একেবারে দুই জনকেই লওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হইলে ত পুরুষকেও স্ত্রীর সঙ্গে যাইতে হয়? সৌভাগ্যের বিষয়, এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ রাজ প্রসাদে এক্ষণে স্ত্রীজাতি সে অপমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তাই বলি, যে ইংরেজরাজ ভগবৎ-প্রেরিত। এ সকলের প্রতিকার তোমরা করিতে কি? না মৃত ব্যক্তির বিষয় লাভের জন্য, কোন মতে প্রত্যবায় স্বরূপা তৎপত্নীকে অনলে পোড়াইয়া মারিতে? এ কথাটি আমার নিজের নহে। ডাক্তার কেরী, যাঁহার যত্নে সহমরণ প্রথা নিবারিত হয়, তাঁহার এই মত। তিনি যৎকালে সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য সংকল্প করেন, তখন প্রতি বৎসর রাশি রাশি স্ত্রীলোককে ছলে, বা বলে, এইরূপে বিনাশ করা হইত। কি দারুণ নারীহত্যা! আবার সেই প্রথা প্রচলিত রাখার জন্য কত জেদ, কত শাস্ত্রের যুক্তি [illegible]

পাষণ্ড, আছেন, যাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা হইলে পুনরায় ঐ প্রথা প্রচলিত করেন। ধিক্! যে বিদেশীয়ের দ্বারা তোমাদের এই অত্যাচার নিবারিত হইতেছে, তাহাদের হস্তে ভগবান্ কেন না তোমাদের জীবন, ধন এবং সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবেন? তোমরা আপন পরিবারের দাসত্ব মোচন করিয়া সামান্য অসুবিধা সহ্য করিতে পার না, আর ইংরেজ পৃথিবীর দাসত্ব মোচন জন্য আপনার জীবন দিতেছে। দেখিয়াও শিখিবে না। চা-কর, নীলকর প্রভৃতির কথা আনিবে। আনিতে পার, কিন্তু তাহা বোধ হয়, ব্যক্তিগত দোষ, জাতীয় নহে। এদেশের জল বায়ুর গুণে, অথবা আমাদের সংস্পর্শ দোষেই বুঝি ইংরেজেরও স্বেচ্ছাচারিতা জন্মে। আর, ব্যক্তিগতই হউক বা জাতীয়ই হউক, তোমরা আপন আপন কর্ম্মফল ভোগকর, তাহার পর যাহার যেমন কর্ম্ম, তৎফলভোগ কে কি করিল, কি না করিল, তাহা দেখিবার অধিকার তোমাদের কি আছে? তোমরা যে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছ, সে দোষ এখনও ঘুচাও না। একবার যবন আসিয়া অনেক দেব দেবী ভাঙ্গিয়া, কল্মা, পড়াইয়া, মুখে থুথু দিয়া গিয়াছে। তখন ইংরেজী রুটী বিস্কুট ত হয় নাই ভাই, তখন ত কেহ হেট কোট পরিত না, তবে হেট কোট আর রুটী বিস্কুটের দোষ দেও কেন? তোমাদের কর্ম্মফল বলিতে লজ্জা পাও কেন?

সহমরণ যদিও কোনও মতে উঠিয়া গেল, কিন্তু বিধবাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া রাখার প্রতিকার, আর হইল না। কেরি সাহেব ইংরেজ, যাহা ধরিলেন, তাহাই করিলেন, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি বাঙ্গালী, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছুই ফল

হইল না। বিধবাদের বিবাহ দূরে থাকুক, একাদশীর উপবাসটা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল না। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব সম্প্রদায় করিয়া যাহা করিলেন, তাহা পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাপুরুষদিগের নিকট একটা হেয় ব্যাপার হইয়া পড়িল। এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌরবের বিষয়ও বড় কিছুই দেখা যায় না। তবে একাদশীটা কেবল মাত্র শ্রীক্ষেত্রে বাঁধা পড়িয়া রহিল। চৈতন্যদেব মহাপুরুষ স্বরূপে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যের মর্ম্ম সম্বন্ধে সকলেই অন্ধ রহিলেন।

স্ত্রীজাতি পতি বিয়োগে আর বিবাহ করিবে না, ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিবে; কেন? যদি সংসারকে জগদীশ্বরের রাজ্য জানিয়া, স্ত্রীপুরুষকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে হয়, তবে স্ত্রীবিয়োগে পুরুষেব দ্বিতীয়বার বিবাহেও যে দোষ, স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগে দ্বিতীয়বার বিবাহেও সেই দোষ। উভয়ই সমান ব্যভিচার। যদি একে না ব্যভিচার হয়, অপরেও নাই। এক মাত্র সমাজ সুশৃঙ্খলে রাখার উল্লেখ বা শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া ভিন্ন, এ কথার আর কি প্রতিবাদ আছে? ভাল, বল দেখি, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোনও সামাজিক নিয়ম কোথাও চলিতে পারে কি? যদি চলে, তবে আহার বন্ধ করিলেও ত বিশেষ উপকার হয় দেখিতেছি। যদি কেহ আহার বা আহারের চেষ্টা না করে, তবে সংসারের কত উৎপাতই যে মিটিয়া যায়, তাহা আর বলা যায় না। একটা নিয়ম কর না কেন, যে কেহ আহার করিতে পারিবে না। শাস্ত্রে এই মর্ম্মের গোটাকত শ্লোক এখনও লেখাইয়া দেওনা কেন? এখনও ত তাহা কোথাও কোথাও চলিতেছে। হাসিও না, ক্ষুধার পরই যে বৃত্তি প্রবল,

যাহা হইতে সংসারের সৃষ্টি, বরং বলিতে পার, অগ্রে সৃষ্টি পরে স্থিতি, অর্থাৎ ক্ষুধার উপরেও যে বৃত্তির প্রাধান্য, তোমরা আপন মহিমাগুণে সে বৃত্তি উড়াইয়া দিয়া সমাজ রক্ষা করিবে! বাহাদুরি বটে, কিন্তু এ বাহাদুরি রাখিতে পার কৈ? পারিতেছ কি? যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহা বজায় রাখিয়া, সাধারণের যতদূর সুখের হেতু করা যায়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই প্রকৃত সামাজিক নিয়ম। এ দিকে বৃদ্ধ মৃতপত্নিক ব্যক্তিও বিবাহ করিবে, বিবাহ করিবে কাহাকে? বালিকাকে, কন্যা, দৌহিত্রী প্রভৃতি অপেক্ষাও কনিষ্ঠা বালিকাকে! অথচ বিধবা বালিকারও বিবাহ ব্যবস্থা নাই। বৃদ্ধের এ পরিণয়, কেবল বালিকার চিরজীবনের সুখ বিনাশ করিয়া, পাশব রিপু মাত্র চরিতার্থ করা ভিন্ন আর কি? ইহাদের পরস্পর প্রণয়, দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি হইতে পারে কি? এসকল স্বর্গীয় পদার্থ ত্যাগ করিয়াও কেবল পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বৃদ্ধের বিবাহ ব্যবস্থা আছে, অথচ যাহার সংসার বাসনা সম্পূর্ণরূপে অতৃপ্ত, এমন বালিকাকেও সংসার সুখে বঞ্চিত রাখিবে।

যদি বালিকার পতি বিয়োগেও পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, তবে আদৌ বিবাহ না দিলেই বা দোষ কি? সেখানে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুমারীর বিবাহ দিতেই হইবে বল কেন? শাস্ত্রও ত তোমরা মাননা। মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, শাস্ত্র ত তোমরা মান না। যদি শাস্ত্র মানিতে, তবে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইয়া বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রীয় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মানিয়া

চলিতে। সে যুক্তি, সে মীমাংসা কে খণ্ডন করিতে পারিয়াছেন? কেহই না। এখনও ত সকলের মুখেই শুনিতে পাই, যে সমাজে প্রচলিত নাই বলিয়া তাহা হইতে পারে না। সমাজও কতদূর মানিয়া চল, সে কথা পরে হইবে; এখন শাস্ত্র যে তোমরা মানলা, সে সম্বন্ধে আর গোটাকত কথা না বলিয়া ঐ একটা কথা বলিলে, হয়ত বলিতে পার, যে ঐ টাই যেন আবশ্যকীয় বলিয়া বলিতেছি। তোমরা নির্লজ্জ, আরও গোটা কত কথা শুন, যখন বলিতে বসিয়াছি, তখন ভাল করিয়াই বলি।

প্রথম, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও, তোমরা তাহা মানিবে না। সে ত গেল, তার পর আর এক কথা বলি, রাগ করিওনা, ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া বল দেখি ভাই, আমরা ত জাত্যভিমানে পূর্ণ। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ত কথায় কথায় বলিয়া থাকি। এখন আবার (revival এর, অর্থাৎ) হিন্দুয়ানীকে (?) পুনর্জীবিত করিতে কৃত সংকল্পের একটা দল হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের বিষ নাই, কুলার ন্যায় চক্র আছে, যত জানুন না জানুন, শূদ্র ব্রাহ্মণকে পৃষ্ঠদণ্ড দর্শাইয়া প্রণাম না করিলে, হঠাৎ তাহার পিতৃ সম্বন্ধে হয়ত একটা অশুচি আহারের ব্যবস্থাই করিয়া বসেন, কিন্তু বল দেখি ভাই, ব্রাহ্মণ কে আছে? পূর্ব্ব পুরুষে কে কোন্ কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া লোকে ব্রাহ্মণ হয় না। এমন কি, ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলেও ব্রাহ্মণ হয় না; "জাত-কর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচি। বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।" ইত্যাদি ব্যতিরেকে, অর্থাৎ যত দিন না সংস্কার হইবে, ততদিন তুমি দ্বিজ মধ্যেই গণ্য হইবে না। একণে, সংস্কার কি? ব্রাহ্মণের ত দশবিধ সংস্কার; 'গর্ভ

কয়টি সংস্কারই চাই। তন্মধ্যে দ্বিজপদ বাচ্য হইবার জন্য প্রধান সংস্কার যে উপনয়নাদি, তাহা কাহার হইয়াছে বল দেখি? উপনয়ন অর্থে বেদাদি অধ্যয়ন জন্য গুরুগৃহে গমন করিয়া, পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন করতঃ ফিরিতে হইবে, সেই ফিরিয়া আসার নাম সমাবর্ত্তন। তোমাদের মধ্যে, কাহার না উপনয়নের দিনই অথবা ২।৩ দিনের মধ্যেই সমাবর্ত্তন হইয়াছে? অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর দূরে থাকুক, উপনয়নের পর দ্বাদশ দণ্ড অতিবাহিত হইতে না হইতেই সমাবর্ত্তন হইল। এই খানেই বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্যাদির শেষ। তার পর ষট্‌কর্ম্ম। ব্রাহ্মণের কার্য্য যজন যাজনাদি ছাড়িয়া শূদ্রের কার্য্য চাকরিই প্রায় কর। যদি শাস্ত্র মান, তবে তোমাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মণ নহে (সবিশেষ মীমাংসাদি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। আর যদি শাস্ত্র না মান, তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি বলিয়া মর কেন? যাঁহারা তোমাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেন, তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ তৈলবট এবং দক্ষিণাদি পাইলে, যেমন ইচ্ছা কর, তেমনই ব্যবস্থা দিবেন। এই করিয়া দেশের ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। আর তোমরাও, যখন গরজ পড়ে, ব্যবস্থা লও, আবার যখন অন্যের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা তোমাদের মনোমত না হয়, তখন বল, যে "ও ভট্টাচার্য্যেরা তৈলবট পাইলে সকল ব্যবস্থাই দিয়া থাকেন, ও ব্যবস্থা মানিলে চলে না।" বলিয়া দলাদলি করিতে লাগিয়া যাও। তাই বলিতেছিলাম, শাস্ত্রও তোমরা মান না। তোমরা মান কি? রাজা মান না, বিদেশীয় রাজা, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার নাই, একটা ওজর

পাইয়াছ; আইন, ঘাড়ে ধরিয়া মানায়, তাই মান, নহিলে তাহাও মানিতে না। বিদেশীয় রাজা আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া লাফাইয়া চীৎকার করিয়া পৃথিবী ফাটাইয়া দেও। আমাদের সমাজ সম্বন্ধে রাজার প্রভুত্ব মান না। তাই বলিলাম রাজা মান না। শাস্ত্র মান না, সমাজ মান না, তোমরা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ, তাই তোমাদের দুর্দ্দশাও এত।

তোমরা বলিবে সমাজ মানি। সমাজ মান? তোমাদের সমাজে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ, তাহা নিজে করিতেছ, কত শত লোক করিতেছে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য বলিয়া জানিতেছ, অথচ তাহাদের লইয়াই সমাজভুক্ত আছ। আমাদের সমাজের সাড়ে পনের আনার উপর লোক নিতান্ত সমাজবহির্ভূত কাজ করিতেছে। তাহাদের ছাড়িলে সমাজ কোথায় থাকে? এমন কি, যে সকল কার্য্য পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বেও, লোকে সমাজের ভয়ে, গোপনেও করিতে পারিত না, এখন সে সকল কার্য্য স্পষ্ট দিবালোকে, সর্ব্বজন সমক্ষে প্রধান প্রধান লোকেও করিতেছে, কই কাহারও সাধ্য আছে কিছু করিতে পার? সমাজে এমন একজনও তেজীয়ান্ পুরুষ নাই, যে তিনি এ সকলের কোনও প্রতিকার করিতে পারেন। কেন পার না? তোমরা হীনচিত্ত হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া। তোমাদের গ্রামে যদি একজন হিন্দুয়ানীভক্ত বর্দ্ধিষ্ণু লোক থাকেন, তিনি হয় ত একজন হীনবলকে কুক্কুট ভক্ষণ করিতে দেখিলে, একঘরে করিতে পারেন, কিন্তু তার পরদিন, তিনি নিজে হয়ত এমত একটি কুৎসিত কার্য্য করিবেন, যে তাঁহার

মুখ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তখন সেই গ্রামের সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে পার, তবে বুঝি তোমাদের সমাজ, তোমাদের সামাজিক বল। এ বলের গৌরব বুঝিলে আর আমাদের এ দুর্দ্দশা!

ভাই, সুরা পান কত বড় পাতক জান? সুরাপায়ীকে সুরা, জল, দুগ্ধ বা ঘৃতাদির অন্যতম পান করাইয়া বিনাশ করাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। জীবন থাকিতে সুরাপায়ীর সংশ্রবও পরিহার্য্য। তপ্তসুরা পান করিয়া মরণেরও একটা ব্যবস্থা আছে। "কলৌ পততি কর্ম্মণা" অর্থাৎ নিজে পাপ না করিলে, কলিকালে সংস্পর্শ জন্য পতিত হয় না বলিলেও, সুরাপায়ী নিজে ষোল আনা কর্ত্তা। তাহাকে ত্যাগ করিতে পারনা? যদি একজন বিলাতে যায়, অথচ তাহার অন্য দোষ না থাকে, তবে তাঁহাকে ত্যাগ কর কেমন করিয়া? বিলাত গমনাদিতে যদি কোনও পাপ থাকে, যদি শাস্ত্রাদি বিশেষ অন্বেষণ করিয়া, কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে তৎপ্রতিকূলে এক আধটা শ্লোক বাহির করিতে পার, তা জিজ্ঞাসা করি, যে সে পাপটা সুরা পানের অপেক্ষা গুরুতর, না অনেক লঘু? যদি লঘু হয়, তবে, সুরাপায়ীকে ত্যাগ না করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ কর কেন? তাঁহাদের সমাজে রাখিলে তোমাদের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া নাকি? না তাঁহাদের ত্যাগ করিলে এখনও চলে, সুরাপায়ীকে ত্যাগ করিলে আর চলে না বলিয়া? তাই বোধ হয়, আমাদের জাতির আর ভদ্রস্থ নাই। ভগবান্ এত অন্যায় কি কখনও সহ্য করেন?

কেহ কেহ বলিবেন, বিলাত গমনকারী আবার আমাদের

উপকার করিবে কি? যাহারা সমাজ ত্যাগ করিয়া গেল, সে আবার সমাজের কি উপকার করিবে? আমি বলি, যদি কেহ সমাজ সংস্কার করিতে কখনও পারে, ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেই করিবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহারা যে অগ্রগণ্য, তাহার সন্দেহ নাই। মূর্খের দ্বারা, অজ্ঞের দ্বারা, কখনও কি কোন বিশেষ ভাল কার্য্য হওয়ার আশা করা যায়? আরও, বিলাত ফেরতরা সমাজ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, না তোমরা তাঁহাদিগকে সমাজ ত্যাগ করাইয়াছ? ইঁহারা কত কষ্ট সহ্য করিয়া, কত ব্যয় করিয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, যাই দেশে আসিলেন, অমনি তোমরা তাঁহাদের সহিত একেবারে সংশ্রব ত্যাগ করিলে! শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন যদি কেহ তাঁহাদের সহিত সংশ্রব রাখে দেখ, তাহা হইলে তাহাকেও যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিতে ক্রটী করনা। দুই একজন পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যাভিমানী, শাস্ত্রের দোহাই দিতে লজ্জিত, অথচ একটা ওজর দেখান চাই, আর কোনও কথা না পাইয়া, শেষে বলিয়া বসেন, 'আপনারা সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিয়া বিলাত গমন করিয়াছেন, আপনাদের সহিত সহানুভূতি কি?' সমাজের বক্ষে পদাঘাত কিরূপ, তাহা ত বুঝিলাম না। যদি বিলাত গমনে, সমাজকে অগ্রাহ্য করা ভিন্ন অন্য অপরাধ না থাকে, বরং উপকার থাকারই সম্ভাবনা থাকে, তবে ত আর সমাজে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না? যখন যে যাহা নূতন কার্য্য করিবে, ভাল হউক, বা মন্দ হউক, তাহা সমাজের বক্ষে পদাঘাত! ভাল, সুরাপান, ব্যভিচারাদি দুষ্ক্রিয়া, যখন সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, বা সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে, তখন কি

সমাজের অনুমতি লইয়া, অথবা মাথায় হাত বুলাইয়া হইয়াছে? হোটেলে বসিয়া খাইতে পার, কিন্তু বিলাতগামীর অন্ন গ্রহণ করিতে পার না? এ সকল ব্যবহারে তাঁহারাও যে কালা পাহাড় হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? যতটুকু না হন, ততটুকু তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষার গৌরব।

যদি তোমরা তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ কর, যদি তাঁহারা আসিয়া সম্মান পান, যেমন ছিলেন, তেমনই থাকিতে পান, তাহা হইলে দেখ দেখি, তাঁহাদের ভাব কত বদলাইয়া যায়, তাঁহাদের দ্বারা তোমাদেরও বিস্তর উপকার হয়, সন্দেহ নাই।

আবার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের ওজর করিয়া মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে ছাড় না। কোন্‌টা যে সমাজে অপ্রকাশ্য হয়, তা ত বুঝি না, যাহা তুমি আমি সকলেই জানি, তাহাই প্রকাশ্য, অথচ কর্ত্তাকে মিথ্যা বলাইলেই তোমাদের ভাল হয়।

আমরা হীনত্বের পরিচয় আর কত দিব? কেবল বিলাত ফেরত কেন? আমাদের দেশের লোকের মধ্যে যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে গণ্য, পরিচিত, অথবা সম্ভ্রান্ত হন, তাঁহাদিগকেই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করি। নহিলে মূর্খের প্রভুত্ব থাকে কই? ভাল করিয়া উৎসন্ন যাওয়া চাই ত। মহাত্মা রাম মোহন রায় প্রভৃতিকেও আমরা আমাদের বলিবার অধিকার রাখি নাই। ইহা কি সামান্য দুঃখ, লজ্জা ও ঘৃণার কথা! এক কথায়, এ সমাজে মহত্ত্বের গৌরব নাই, তবেই সমাজের মহত্ত্ব যে কতদূর, তাহা অনুভূত হইল। ধিক্ এ সমাজে, আর অধিক কি বলিব।

যাক্, আবার অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। না আসিলেও চলে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে বিধবাদিগের বিবাহ ত

দিবে না ; তার উপর, ব্রহ্মচর্য্যের অছিলা করিয়া তাহাদিগকে ভাতেও মারিবে। যদি একাদশীর ব্যবস্থা বিধবার পক্ষেও যেমন, আপামর সাধারণের পক্ষেও ঠিক তদ্রূপ হয়, কোনও প্রভেদ না থাকে, (পরিশিষ্ট দেখ), আর তোমরা জ্ঞানী হইয়া, পণ্ডিত হইয়া, অন্যরূপ আচরণ কর, তবে বিধবারা এমন কি অপরাধ করিল, যে তাহারাই গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে? যদি বল, তাহারা ইচ্ছা করিয়া করে, সে কথা ততদূর বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাহাদিগকে তোমরা নানারূপ ইহ-পরকালের বিভীষিকা দেখাইয়া যেমন বুঝাইয়াছ, তাহারা তেমনই বুঝিয়াছে। তাই কি সহজে তাহারা এ কষ্ট সহ্য করিতে পারে? কই, তাহাদের বল দেখি, যে "শাস্ত্রে একাদশীর ব্যবস্থা তোমাদের প্রতিও যেমন, আমাদের প্রতিও তেমনই, কিন্তু আমরা সে ব্যবস্থা মত চলি না, বা চলিতে পারি না," দেখ দেখি, কয়জন আর একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করে? তোমাদের প্রতি ব্যবস্থা সত্ত্বেও, তোমরা যে কর না, এ কথাটি কিন্তু তাহাদের বলা চাই, তখন যদি দেখ, যে তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক করে, ত কথা নাই। বুঝিয়া দেখ দেখি, তাহা হইলে কত বিধবা একাদশীর উপবাস ত্যাগ করে! সকলে আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে ত কার্য্য করিবে? যদি সকল বিধবার সাত্ত্বিকী প্রকৃতি হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তিযুক্তা বিধবা (সুধু বিধবা কেন, মনুষ্য বল না,) লক্ষের মধ্যে একটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাহার প্রকৃতি সাত্ত্বিকী, সে আপনা হইতেই তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। তাও, প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ভালরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, নিরম্বু উপবাস অবিধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু যাহার সে প্রকৃতি নহে, সে কেন সাত্ত্বিকী প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য্য করিবে? যাহার রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতি, সে আপনার প্রকৃতির বশে যে কার্য্য করিবে, তাহা কি তুমি আমি বারণ করিয়া রাখিতে পারিব, না পারি? "সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি"। সেই বারণ করার ফল দেশময় দেখিতেছ ত? তাহা বর্ণনা করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিবার প্রয়োজন কি? পাত্র ভেদে ধর্ম্মভেদেই না হিন্দু ধর্ম্মের মহত্ত্ব? সে কথা এখানে না মানিবার কারণ কি? স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কি বলিব? আমাদের মধ্যে রজোগুণ ও তমোগুণের আধিক্যই দেখা যায়। এমত অবস্থায় তোমরা বলপূর্ব্বক সাত্ত্বিক কার্য্য করাইতে গেলে, তাহা বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের উপায় বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এদিকে, একাদশীর দিন যখন পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যায়; মুমূর্ষু যখন মৃত্যু শয্যায় শুইয়া, কেবল জল না পাইয়াই মরিতেছে, এমন বিস্তর ঘটে; (দুই একটা ঘটনা আমরা বিলক্ষণ জানি,) তখন সে সকল স্ত্রীহত্যার পাতকী কে? রোগীর উপর বৈদ্য শাস্ত্রের অধিকার, অন্য কোনও ধর্ম্ম শাস্ত্রের নহে। আপনারা যেমন বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানী, স্ত্রীলোক দিগকেও তদধিক করিয়া তুলিয়াছ, তাঁহার পর ক্রমশঃই অধমাগতি প্রাপ্ত হইতেছ।

স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশা যে অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা চৈতন্যদেব হইতে এখনকার সুশিক্ষিত উন্নতচিত্ত ব্যক্তিগণ সকলেই বুঝিতেছেন, বলিতেছেন, কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে? সকলেই স্ব স্ব প্রধান এবং পণ্ডিত। এদিকে ইংরেজের নিন্দা, ইংরেজীর

নিন্দা পদে পদে; অথচ আপনাদের পাণ্ডিত্য কতদূর, তাহা বিচার করিবার সময় ইংরেজী বিদ্যাটুকু ছাড়িয়া দিয়া দেখ দেখি, কি বাকি থাকে? তাও ত খান কত সাহিত্য, একটু গণিত, হয়ত বিজ্ঞানের একটু আভাস, ইহা লইয়াই পাণ্ডিত্য; তাহারই অভিমানে পৃথিবী খানা শরার ন্যায় দেখিতেছি। আবার ইংরেজের দোষ টুকুও আগে অনুকরণ করিয়া বসি।

এখনও revival এর দল স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" একথাটাও আমাদের শাস্ত্রের। শিক্ষা রীতিমত না হওয়ায়, এবং তোমাদের দোষে, শিক্ষার যে কুফল, তাহারই গোটাকত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাক, কিন্তু জান না, যে সৎশিক্ষা ব্যতীত মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয় না। তোমরা নিজেই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল। একটি শিশু জলে ডুবিয়া মরিতেছে, আমার পুত্র তাহাকে তুলিয়া বাঁচাইল, গৃহিনী শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোর কি গরজ ছিল? তুই যদি সেই সঙ্গে ডুবে যেতিস্!" ছেলেটির দফা জন্মের মত রফা। মাতার কাছে যে শিক্ষা পাইল, এবং যে তিরস্কৃত হইল, তাহাতেই জন্মের মত তাহার চিত্ত সঙ্কুচিত হইল এবং সৎকার্য্যে বিরতি জন্মিল। কিন্তু আবার ইংরেজের সুখ্যাতি করিয়া বলি, "ইংরেজের মাতা এই কথা শুনিলে, অনেক স্থলেই, তখনই তাহাকে উৎসাহ দিবে, এবং তাহার কার্য্যের প্রশংসা করিবে। শিশুর বুক দশ হাত হইল, এবং সৎকার্য্যের গৌরব বুঝিল। এরূপ ঘটনা উভয় পক্ষেই যে সর্ব্বত্র একই রূপ হয়, তাহা বলি না, কিন্তু অনেক কার্য্যে এরূপ প্রভেদ ঘটে। জননী শিক্ষিতা এবং প্রশস্তচিত্ত

না হইলে, সন্তান উচ্চচেতা হইতে পারেনা, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্যই লিখিত, "নারীহি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ। তস্মাদ্ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী।"

যাঁহারা ইংরেজী ভালরূপ জানেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইবেনা। যাঁহারা আমাদের শাস্ত্রের দোহাই দেন, অথচ কিছু জানেন না, তাঁহাদিগকে বলিতেছি, বিবাহের সময় যে সকল মন্ত্র পড়েন, তাহার মধ্যে যে সকল উচ্চভাবের কথা আছে, তাঁহার মর্ম্ম বুঝেন কি? পতি স্ত্রীকে বলিতেছেন, "ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরেভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূাংভব, ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু," এ কথার অর্থ করিয়া পিতা, মাতা, ভগিনীর সম্মুখে অশিক্ষিতা স্ত্রীকে বলিতে পারেন কি? তাহা হইলে আর বিবাহ করিতে যাইবার সময় বলিয়া যাইতে না, যে "মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।" যে ভাষা মা বুঝিতে পারেন, তাহাতে মাকে দাসী আনিবার নাম করিয়া, মা যাহা বুঝিতে পারেন না, সেই ভাষায় স্ত্রীকে, পিতা মাতা প্রভৃতির উপর সম্রাজ্ঞী হইতে বলিলে? এ প্রবঞ্চনা সে কালের লোক করিতেন না, করিলে তাঁহাদের মহত্ত্ব থাকিত না। তখন তাঁহারা যথার্থই একথার মর্য্যাদা বুঝিতেন। স্ত্রীও একথার মর্ম্ম বুঝিতেন, পিতা মাতাও বুঝিতেন। এখন তোমরা প্রকৃত পক্ষে প্রথমে দাসী আন, পরে, স্ত্রী আপনা হইতে সম্রাজ্ঞী হইয়া উঠিলে, তোমরা আজ্ঞাবহ হও। এ গুলি শিক্ষার অভাব ব্যতীত আর কি?

তাই বলি, যদি দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চাও, তবে স্ত্রীজাতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করতঃ, যাহাতে

অগ্রে তাহাদের উন্নতি করিতে পার, তৎপক্ষে যত্নবান্ হও। তাহাদের শিক্ষা, গৌরব রক্ষা, মানসিক উৎকর্ষ প্রভৃতি সাধনে সযত্ন হও, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের স্বভাব সংশোধন করিয়া দৃষ্টান্তস্থল হও, সন্তান সন্ততিও আপনা হইতে মহদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিবেই। তাহা না করিতে পার, চিরকাল অধঃপতনই হইতে থাকিবে।

আমরা বলি, আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি যেমন সতীত্বের গৌরব বুঝে, এমন আর কোনও জাতিতেই বুঝে না। একথা মানি, কিন্তু সে গৌরব, বিশেষ স্পর্দ্ধার বিষয় মনে করি না। যদি চিত্তের মহত্ত্বগুণে ব্যভিচারকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া, তৎপ্রতি অবজ্ঞা করিতে পারে, তবে গৌরব বটে, তথাপি আত্মগৌরবের স্পর্দ্ধা করা দূষ্য। আর যদি সুযোগ অথবা সময়াভাবে, অথবা ভয় প্রযুক্ত ব্যভিচার হইতে বিরত হয়, তাহা স্পর্দ্ধার বিষয় নহে, বরং আরও লজ্জার কথা। একথা লেখাতে কেহ মনে করিবেন না, যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য, তাহা কোন মতেই নহে, বরং তদ্বিপরীত, তবে ইহা বলার অর্থ এই, যে যাঁহারা মনে করেন, যে স্ত্রীলোককে মূর্খ এবং অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেই তাহারা ভাল থাকে, এবং লেখা পড়া শিখিলেই বিকৃত হয়, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। মনের উন্নতি ব্যতীত শাসনে শান্ত থাকা, কোন কার্য্যেরই নহে।

প্রতিকারের শক্তি থাকিতে কেহই শাসনের বশীভূত হয় না। আর শাসনে বশীভূত করিলে, সুযোগ পাইলেই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। আমাদের দেশের বধূ এবং গৃহিণী জীবনের

পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, প্রতিপদে ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

সাম্যই জগতের সুখের হেতু, বৈষম্য অনর্থের মূল। আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষের এই বৈষম্য যত অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তত আর কিছুই নহে। সমগ্র পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ, যে জাতির মধ্যে এই বৈষম্য যত অল্প, সেই জাতিই তত শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা, তাহার পর ইউরোপ, এ সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও মানিবে না! ভাল, আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস দেখ। যখন ভারত অজেয়, পৃথিবীর মধ্যে প্রধান জাতি, তখন ভারত রমণীর এ দুরবস্থা কথনই ছিলনা। রামায়ণ ও মহাভারত পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা কর, তার পর ক্রমে যত পুরাণাদি শাস্ত্র স্বরূপে গণ্য হইতে আরম্ভ হইল, দেশেরও কপাল ভাঙ্গিতে লাগিল। সেই সকলের গৌণ ফল মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত জয়।

যখন বাঙ্গালা তন্ত্রে, কদাচারে নিমগ্ন প্রায়, তখনই চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব। তিনি প্রেম, ভক্তি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন প্রভৃতি অনেক পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেহই চিরজীবী নহে, কালে, পাণ্ডিত্যাভিমানী স্বার্থপর দাম্ভিক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহার আদিষ্ট প্রথাও হেয় হইয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও সে গৌরব রক্ষা করিতে পারিল না। বঙ্গের দুর্দ্দশা বিধিমতেই হইতে বসিয়াছে। আর কেন? ক্ষান্ত হও।

তাহার পর বর্ণগত বৈষম্য, ধর্ম্মগত বৈষম্য, সম্প্রদায়গত, কুল গত বৈষম্য, বৈষম্যের ছড়াছড়ি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি;

ব্রাহ্মণ বংশে, এখন ব্রাহ্মণত্ব প্রায় কাহারই নাই। প্রায়টাও লজ্জার খাতিরে বলা মাত্র। যখন সংস্কার, আচার, ব্যবহার, কিছুই ব্রাহ্মণের মত নাই, তখন কেন আর ব্রাহ্মণ বলি? তথাপি বর্ণগত বৈষম্য আছে।

ধর্ম্মগত বৈষম্য,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম, প্রভৃতি কতই না ধর্ম্ম এই এক ভারতে বিরাজমান। মা আমাদের অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।

তাহার উপর এই এক হিন্দুদিগের মধ্যে কতই সম্প্রদায়, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, ইত্যাদি। ইঁহাদের মত ভেদের জন্য শাস্ত্রাদি এমত কলুষিত হইয়াছে, যে তাহা আর বলিবার নহে। দুই একটা বলি, কেহ রাগ করিবেন না, সঙ্গত কি অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দেখুন। বেদ অথবা রামায়ণ মহাভারতের সময় শিব অথবা দুর্গা পূজাদির কোনও কথাই ছিলনা। পরে তন্ত্রের সময় হইতে আবির্ভাব; কিন্তু পাছে রামায়ণাদিতে শিব শক্তির কথা না থাকিলে অগ্রাহ্য হয় বলিয়া, রাম কর্ত্তৃক রাবণ বধকালে দুর্গোৎসবের কথা বলা হইয়াছে, দুর্গোৎসব রামায়ণে নাই, অগ্নি পুরাণে আছে। ঘোর কলিকালে দুর্গার আবির্ভাব। বোধ হয়, দেশের ভাবি দশার সূত্রপাত দেখিয়াই দুর্গার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। মা ভাগবতী শক্তি, অবাধ্য অসুর-প্রকৃতি ভারত সন্তানকে কিরূপে শাসন করিতেছেন দেখ। এ দিকে সিংহ একপদে উরুদেশ চাপিয়া হস্ত দংশন করতঃ হাতপা ভাঙ্গিয়া রুধির পান করিতেছে। আবার ম্যালেরিয়া ওলাওঠা প্রভৃতি রূপ কালসর্প বিষে জর্জ্জরিত করিতেছে। মনে করিওনা, যে সর্প আপনা হইতে আসিয়াছে। সর্পও মার

প্রেরিত, ঐ দেখ সর্পের লাঙ্গুল তোমার কেশের সহিত মাতৃহস্তে ধৃত। মার দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে, বাম পদ তোমার স্কন্ধে। মা তোমায় বাম কি না? আবার নানা মতে শস্যহানি ও ক্ষয়াদি জনিত দুর্ভিক্ষরূপ বর্ষাও তোমার বুকে বিদ্ধ। এখনও মার শরণাপন্ন হও, নচেৎ ঐ দেখ, মা এখনও খড়্গ চাপিয়া রাখিয়াছেন, স্নেহবশতঃ তুলিতে পারিতেছেন না, কিন্তু অধিক বিলম্বও নহে, অচিরে ছিন্নশির হইবে। এখনও মুখভঙ্গী ছাড়িয়া "মা" বলিয়া ডাক, মা অভয় দিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন। তখন সকল ভয়ই অপসৃত হইবে। শত্রুও মিত্র হইবে।

তারপর, মহাভারতে শিবের কথা অনেক স্থলে পাওয়া যায়, কিন্তু বোধ হয়, তাহা অনেক পরে বসান। ভগবদ্গীতা প্রকরণের পূর্ব্বের দুর্গাস্তোত্র, (দুই একটি শ্লোকার্থে ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা স্তোত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সেটিতে একটু চালাকি আছে; সাধারণে, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দুর্গাস্তোত্র মনে করুক, অথচ যেথানে অসঙ্গতি দোষ দেখাইয়া বেশী চাপাচাপি হইবে, সেথানে ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেই রেহাই), জয়দ্রথবধ কালে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের শিবের নিকট গমন প্রভৃতি অংশ গুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, যে উভয় অংশ এক লেখনী নিঃসৃত নহে। যে লেখনী ভগবদ্গীতা লিখিয়াছে, সে লেখনী পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই দুর্গাস্তোত্র লিখিতে পারে না। যে অর্জ্জুন ভক্তি প্রভাবে দেবাদির আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী হইল, সেই অর্জ্জুন কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারিল না, এবং যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকংশরণং ব্রজ" ইত্যাদি বলিলেন, তিনিই যে "আমারও সন্দেহ হইতেছে

অতএব মহাদেবের নিকট চল” এরূপ কথা বলিবেন, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব ?

সে যাহা হউক, সে সকল বৃথা বাগ্বিতণ্ডার এস্থলে প্রয়োজন নাই। সময়ান্তরে একথার উল্লেখের ইচ্ছা আছে। তবে এক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া পরস্পরের বিদ্বেষ, এবং সকলে স্ব স্ব মত শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, শাস্ত্র প্রক্ষিপ্তাংশে পূর্ণ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। যিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিবেন, তিনিই পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবেন।

এ সকল বৈষম্য ভাব যে দূরীভূত হইবে, এমন আশাও ত দেখা যায় না। আমরা বৈষম্যের কথা এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়া, অপর বিষয়ের আলোচনা করিব। কোনও সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে উল্লিখিত বিষয় লিখিত হয় নাই। শাস্ত্র প্রক্ষিপ্তাংশে পূর্ণ বলিবার অভিপ্রায়েই উহা লিখিয়াছি। এ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর প্রমাণ আছে। এবং শাস্ত্র কলুষিত হওয়াই, অধঃপতনের মূল ভিত্তি বলিয়াই বোধ হয়।

আমাদের আর একটি হীনত্বের পরিচায়ক মহৎ দোষ এই যে, অসত্য এখন আমাদের মধ্যে বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। শৈশবে মাতার নিকট মিথ্যা ভয়, রহস্যে মিথ্যা, খেলায় মিথ্যা, নানারূপে মিথ্যা শিখিয়া মিথ্যায় দোষ জ্ঞান থাকে না, ক্রমে সেই মিথ্যা সর্ব্বতোমুখী হইয়া আদালতে পর্য্যন্ত গড়ায়। অনেক ধনী, সামান্য প্রজার সঙ্গে হয়ত তুচ্ছ মোকদ্দমায় মিথ্যা বলিয়া থাকেন। তাহাতে সামান্য লোকের যে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা ত বলিবার নহে; আবার অনেক সময় উক্ত উচ্চপদস্থ

ব্যক্তিগণকেও তিরস্কৃত ও ভৎসিত হইতে দেখা যায়। কতদূর লজ্জা ও ঘৃণার কথা মনে করিয়া দেখুন দেখি।

ব্যবসায়ে মিথ্যা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে যাঁহাদিগকে পূর্ব্বে সাধু, মহাজন, প্রভৃতি মহা গৌরবের নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে এখন ব্যবসাদার বলে। অর্থাৎ ব্যবসাদার কথাটা এখন কি ভাবে ব্যবহৃত হয় মনে করুন দেখি?, "এ লোকটা পাকা ব্যবসাদার," বলিলে, লোকটা সম্বন্ধে মনে কিরূপ ধারণা হয়? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অসত্যকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়। প্রতারণা প্রভৃতি অসত্যেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যে দেশে সত্যপালন অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত ছিল, যে দেশে স্ত্রীর নিকট সত্য করিয়াও রাজা দশরথ প্রাণসম পুত্র, এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছিলেন, সেই দেশেই দশটা মিথ্যা কথা কহিয়া চালাকি করিয়া আসিতে পারিলেই বড় উপযুক্ত লোক হয়। আর বাকী কি? এখন পুত্র পিতার সমক্ষে, স্ত্রী স্বামীর সমক্ষে, কন্যা মাতার সমক্ষে, প্রজা রাজার সমক্ষে, ভৃত্য প্রভুর সমক্ষে, অকাতরে মিথ্যা কহিতেছে, কেবল ধরা না পড়িলেই হইল। আর সঙ্গী, ইয়ার, সমকক্ষ, মহাজন প্রভৃতি পাওনাদার, ও ভৃত্যাদির সমক্ষে মিথ্যা কথা কহা ত অঙ্গের আভরণ। নহিলে চলেনা, কি করা যায়। এ সকল, দেশের শ্রীবৃদ্ধি বই আর কি বলিব?

তাহার পর পরনিন্দা ও পরীবাদ। এ দোষ নিতান্ত সার্ব্বজনিক না হইলেও, অনেক স্থলেই দেখা যায়। পাঁচজন একত্র হইয়া খোষ গল্প আরম্ভ করিলেই, তাহার মধ্যে

দু দশটা পরনিন্দা পরচর্চ্চা আছে। অনেকের, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ, অথবা পরের নামে একটা রটনা করা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি প্রতিবেশীর কোনও একটা দোষ পাইলেন, অমনি পাড়ায় পাড়ায় তাহার সংবাদ দিয়া আসিতে হইবে, সময়ে সময়ে তাহাকে মনোমত করিয়া সাজাইয়া সালঙ্কারে আড্ডায় আড্ডায় উপহার দিতে হইবে। বড়ই আনন্দ!! অনেকস্থলে এরূপ লোকের আদর কত? "কি হে আজকার নূতন খবর কি?" অমনি ছোট খাট গেজেট আরম্ভ করিলেন, "আর শুনেছ, অমুকের বাটীতে আজ এই এই ব্যাপার।" তদ্ভিন্ন, অমুক এই কার্য্য করে, অমুক মুখ বাঁকাইয়া কথা কয়, লাফাইয়া হাঁটে, ইত্যাদি কথাই যেন পরম প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। অমুকের কথায় তোমার কাজ কি? তুমি কেন আপন চরকায় তেল দাও না? যদি কাহাকেও অন্যায় করিতে দেখ, এবং তুমি তাহার যথার্থ বন্ধু হও, তবে তাহার নিকট গিয়া সৎপরামর্শ দাওনা কেন? না শুনে, সে কথা ছাড়িয়া দাও। তোমার কেহ অপকার করে, তবে তৎপ্রতিকার জন্য পাঁচজন ভদ্র লোকের সাহায্য অবশ্য চাহিতে পার। একেবারে আদালতে যাওয়া অপেক্ষা আপনা আপুনি মিটাইবার চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু যেখানে তোমার কোনও ইষ্টাপত্তি নাই, সেখানে কেন সে কথা লইয়া বিব্রত হও? এরূপ লোককে অনেকেই মনে মনে বিলক্ষণ ঘৃণা করেন, অথচ পরনিন্দা লইয়া আমোদ করিতেও বড় কাহাকে ছাড়িতে দেখা যায় না। তবে এমন অনেক উন্নতচিত্ত লোকও আছেন, যাঁহারা আদৌ ঐরূপ করেন না, বা উহাকে প্রশ্রয় দেন না।

০ দলাদলি আমাদের একটা রোগ বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। দলাদলি অনেক রকম আছে; সকল দলাদলি দোষের নহে। সকলের ভাব, রুচি, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রকৃতি, সমান হইতে পারেনা। সুতরাং, যেখানে সামাজিক, নৈতিক, বা বৈষয়িক আন্দোলন, সেই খানেই দলাদলি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সভাদিতে দলাদলি হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, সুতরাং সে কথা লইয়া আর গোলমাল করার প্রয়োজন নাই। আমি সে দলাদলির কথা বলিতেছি না। আমি যে দলাদলির কথা বলিতেছি, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। অমুকের ছেলে ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিয়াছে, যদি তাহার সঙ্গে গ্রামের প্রধান বর্দ্ধিষ্ণু দুই একজনের বিবাদ রহিল, তবেই কর্ বেটাকে একঘরে। আজ কালের দিন একঘরে করা নিতান্ত সহজ নয়; কতকগুলি লোক এপক্ষেও জুটিল, মহা দলাদলির ব্যাপার আরম্ভ হইল। উভয় দলের আহার নাই, নিদ্রা নাই, দলের লোক ভাঙ্গান আর ঘোঁট লইয়া দিন কাটিতে লাগিল। অশিক্ষিত নিষ্কর্ম্মা লোকেদের কর্ম্ম জুটিয়া গেল, যাহাদের কেহ জিজ্ঞাসাও করিত না, ক্রিয়া বাটীতেও যাহারা হয়ত প্রায়ই বিনা আহ্বানে একবেলা পাত পাড়িয়া আসিত, তাহাদেরও গুমান বাড়িয়া গেল। পক্ষান্তরে, ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বিধবা ভগিনীর দৌরাত্ম্যে পাড়ার ছেলেদের লেখা পড়া হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা কয় কে? ন্যায়বাগীশ মহাশয় এক চৌধুরি বাটীর সভাপণ্ডিত, তাহাতে নিজে দশকর্ম্মান্বিত, আর অশৌচাদি ব্যবস্থা গ্রামের লোকের যখন যাহা জানিতে হয় তাহা তিনি অকাতরে বলিয়া দিয়া থাকেন, সুতরাং সে পক্ষে

কোনও কথা কাহারও মনেও আসে না। আরও অধিক কথা লিখিতে ঘৃণা করে। সমাজের অবস্থা একবার মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন দেখি। দেখেন অনেকেই, বুঝেন অনেকেই, কিন্তু সমাজের উপযুক্ত মাথা নাই। হইবার সম্ভাবনাও ত দেখি না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কে কাহাকে মানে? এ অবস্থায় শাসন ব্যতীত কার্য্য হয় না। সেই শাসন করে কে? এ কার্য্য রাজার; কিন্তু রাজা বিদেশীয়।

দেশের ত এইরূপ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর কত বলিব? অধিক কচলাইলেই বা ফল কি? সংক্ষেপে যতদূর বলিয়াছি, তাহাতেই কত লোকের বিরাগ ভাজন হইবার আশঙ্কা। কিন্তু না বলিয়াও যে থাকা যায় না। অতএব সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, যে যদি ইহা পাঠে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়, স্থির চিত্তে পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিয়া, যদি অসঙ্গত কথা থাকে দেখেন, তাহা দেখাইয়া দিলে, অবশ্য অপরাধ স্বীকার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নচেৎ আমরা আত্মদোষ প্রতিকারের চেষ্টা কেন না করিব? যে দোষে আমাদিগকে হীন করিয়াছে, যাহার জন্য জগদীশ্বরের নিকট গুরুতর দণ্ড পাইতেছি, এবং আরও কত পাইব কে বলিতে পারে, সেই সকল দোষ কষ্ট স্বীকার করিয়াও পরিত্যাগ করিব।

অনেক স্থলে ইংরেজের সুখ্যাতি করা হইয়াছে, বোধ হয় অনেকের কষ্টকর হইতে পারে, অতএব পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পুনর্ব্বার বলি, যে ইংরেজের দোষ নাই এ কথা কোথাও বলি নাই, তবে কিছু গুণ না থাকিলে, ভগবান পৃথিবীর অপর

প্রান্ত হইতে তাহাদের আনিয়া তোমাদের উপর রাজা করিয়াছেন? কেন, তোমাদের নাই কি? ভাবিয়া দেখ, আর কোন্ জাতির এত একাধারে আছে? তবে কিসের অভাবে ভারতের ভাগ্য মন্দ? তবে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহেন না কেন? ভগবান্ সহায় না হইলে, বলে বল, ছলে বল, কৌশলে বল, কোন মতেই কেহ কিছু করিতে পারে না। একবার একবার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত কর না? ইংরেজের সাহায্য আমাদের এখন আবশ্যক, ইংরেজের কাছে আমাদের এখন কিছু শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয় না কি? ফলেও ত দেখিতেছ, যবন রাজ্যাধিকারে কিরূপ সর্ব্বতোভাবে বিকৃত হইয়াছিল? আর্য্য গৌরব-রবি অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল দোষ আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হইয়া কত দূর হীন এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়া ছিল, এখন তদপেক্ষা অনেক পরিষ্কার জ্ঞান হয় নাই কি? ইংরেজের সহস্র জাতীয় দোষ থাকিলেও, তাহা লইয়া আমাদের আনন্দ বা আস্ফালন করিয়া ফল নাই; আমরা আপনাদের দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইব, এবং তাহাদের যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা গ্রহণ করিব। তাহাতে অপমান নাই। বিদেশীয় জাতি, জেতা রাজার জাতি, আমাদের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করে না, আর আমাদের যত লজ্জা! অথবা আমরা বড় লোক, আর্য্যবংশীয়, আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির কাছে শিখিব কি? তাহারা যাহা কিছু নবাবিষ্কার করিয়াছে, সবই আমাদের ছিল। আর কি? আমরা ধন্য! ধন্য!! আমরা যেমত ধন্য, তাহার

পরিচয় ফলেই দেখা যাইতেছে। "ফলেন পরিচীয়তে"; একটা কথা আছে না? তবে আর কি, বিবেচনা করিয়া দেখ না। মনে মনে অনেকেই আপনাকে বড় ভাবিয়া থাকে, কার্য্যে সে পরিচয় দেওয়া যায়, তবেই না? বিদ্যার গৌরব, চিত্তের স্বাধীন উদার ভাবের গৌরব লইয়া আধুনিক আমেরিকাবাসীগণ কেমন আত্মপরিচয় দিতেছে, আর আমরা আর্য্যসন্তান, আমরা আর্য্যসন্তান করিয়া কেমন আত্মপরিচয় দিতেছি? সেখানে বিগ্রহের নাম নাই, নিত্যশান্তি বিরাজিত, অথচ সসাগরা পৃথিবী যেন তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত, কম্পিত, ও বিস্মিত। কতই ভাঙ্গিতেছে কতই গড়িতেছে, কি না করিতেছে? অপ্রতিহত প্রভাবে সদর্পে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা, আর্য্যবংশীয় ইত্যাদি কয়েকটি বুলি পক্ষীর ন্যায় বারম্বার বলিতেছি, আর পিঞ্জরে বসিয়া শস্য ভোজন করিতেছি। যদি একজন বিদেশীয় পণ্ডিত আমাদের শাস্ত্রের, কি কোনও গ্রন্থের, কি কোনও ব্যবহারের সুখ্যাতি করিল, আমরা তাহার গৌরব বুঝি আর না বুঝি, অমনই আস্ফালন করিয়া উঠিলাম; 'দেখ দেখি অমুক পণ্ডিত আমাদের শাস্ত্রের কত প্রশংসা করিয়াছে, আর তোমরা বল আমাদের কিছুই নাই!' এই সকল কথা বড়ই উপহাসাস্পদ এবং হীনতার পরিচায়ক। অপরে আমাদের গুণ গ্রহণ করায় তাহাদের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, আমাদের তাহাতে গর্ব্বিত হওয়া হীনত্ব। বিশেষতঃ, যদি সে গুণের মহত্ত্ব আগে না বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আরও হীনত্ব। আমাদের কর্ত্তব্য, আমাদের মধ্যে নিয়মে হউক, ব্যবহারে হউক, কোথায় কি দোষ আছে, তাহা দেখিয়া বর্জ্জন করা, এবং

অপরে• যেমন আমাদের গুণ গ্রহণ করে, আমাদেরও তদ্রূপ অপরের গুণ গ্রহণ করা। ইহা উন্নতির সোপান।

তৎপরে বক্তব্য যে, যেমন কয়েকটি দোষের উল্লেখ করা গেল, এরূপ অনেক সামান্য এবং মহৎ দোষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ক্রমে সকলে মিলিয়া সেই সকলের ক্রমাগত আলোচনা করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করিলে, তবে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। নচেৎ এক জনের এক দিনের কথা কোন্ কার্য্যের ? এক বিন্দু বৃষ্টি ভূমিতেই মিশাইয়া যায়। কিন্তু অবিশ্রান্ত বারিধারা শুষ্ক ভূমিতেও জলস্রোত বহাইতে পারে। নিজের দোষ প্রদর্শনে নিন্দা করা হয় না, হীনত্বও হয় না, বরং মহত্বই প্রকাশ পায়। কিন্তু সংশোধনের চেষ্টা চাই। বারম্বার দোষের উল্লেখেও সংশোধন চেষ্টা স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তবে, অভিভাবক বিহীন বালকের চরিত্র সংশোধন করা যেমন অত্যন্ত কষ্টকর, শাসন কর্ত্তা হীন সমাজের দোষ সংশোধন করাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু কি করিবে ভাই! আর কোনও উপায়ও ত নাই, যতদূর পারা যায় চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার অসাধ্যও কিছুই নাই।

উপসংহার কালে আর একটা নূতন রোগের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এটি এখনও তত দোষের না হইলেও, ইহার মধ্যে এক মহৎ দোষের অঙ্কুর নিহিত আছে। একটা হুজুক পাইলে মাতিয়া উঠা ত আমাদের বহুকালের রোগ আছে; হুতোমের নক্সায় মরা মানুষ ফিরিয়া আসা প্রভৃতি হুজুকের কথাও শুনা গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে (planchette) প্লাঁশে প্রভৃতি লইয়া বিলাতী দোকানদারেরা কতই লইয়া

যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটা হুজুগ নিত্যই উঠিতেছে। যখন পাদরি আসিয়া দুই একটা খ্রীষ্টান করিতেছে, তখন সমাজের কঠোর শাসন, কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, এমন সময় রাজা রামমোহন রায় বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ধূয়া তুলিলেন, অনেক শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখাইলেন, যে একেশ্বরবাদই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম; অমনি দেশ শুদ্ধ মাতিল, আবার এখন (revivalism) হিন্দুয়ানী (?) পুনরাবর্ত্তনের ধূয়া উঠিয়াছে, দেশ শুদ্ধ লোকের মুখে শুনিতে পাইবে, আমাদের দেশের ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্ম আর কোথাও নাই, আমাদের শাস্ত্রে সব আছে। ঠিক কথা, আমাদের শাস্ত্রে সব আছে। ভাল, শাস্ত্র আলোচনা কর, তাহার দোষ গুণের বিচার কর, এত বিভিন্ন মতযুক্ত এক শাস্ত্রের সবই ভাল কি? কোথাও কিছু অসার আছে কি না দেখ; তাহা নহে, যাহা যেখানে আছে, সবই ভাল। শাস্ত্রের দোষ গুণ বিচারে আমাদের অধিকার নাই বলিয়া একটা ধারণাই সর্ব্বনাশের মূল। না হয় ঋষিবাক্যই অবিচার্য্য হইল, কিন্তু যে যাহা লিখিবে সবই কি শাস্ত্র? বারানসী প্রভৃতি স্থলে যে সকল পণ্ডিতেরা শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্পষ্ট বলিয়াছেন, "রেখে দে তোদের শাস্ত্র, আমরা রাজকোষ হইতে কিছু অধিক কাল বেতন সংগ্রহ করিবার জন্য অমন কত শাস্ত্র নিজে লিখিয়াছি।" এখনও, যাঁহারা একথায় অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিতের নিকট ভাল করিয়া তত্ত্ব লইলে, জানিতে পারিবেন। এতাদৃশ লেখকগণের লেখা শাস্ত্র লইয়াও আমরা বিব্রত। এতদ্ভিন্ন, কতকাল হইতে কত কারণে

শাস্ত্র কলুষিত হইয়া আসিতেছে। আবার এক যোগের ধুয়া উঠিয়াছে, ত দেশ শুদ্ধ লোক যোগী, যে কেহ যোগের কিছু বুঝুক না বুঝুক, যোগী হইতে হইবে। অমনি চারিদিক্ হইতে গেরুয়া বস্ত্রপরা সন্ন্যাসী যোগী বাহির হইলেন। গৃহে বিবাদ হইল, তৎক্ষণাৎ গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত যোগী, অনেক উমেদারীতে চাকরি জুটিল না, যোগী হইয়া আর আহারের ভাবনা নাই, বোকা ঠকাইয়া খাইবার উপায় হইল; পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতে কাতর হইলাম, অমনি রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া, মানব প্রকৃতির বিরোধী কোনও রূপ একটা বুজরুক অভ্যাস করিয়া লোক ঠকাইতে আরম্ভ করিলাম, যাহা সকলে পারে না, এমন একটা কার্য্য করিতে দেখিলেই, সাধারণে বিস্মিত হয়, সে কার্য্য ভাল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, তাহা অনেকেই বিচার করিতে পারে না, মোহিত হইয়া পড়ে, সুতরাং যোগী হওয়াও সহজ হয়। এক জন আজন্ম বিবাহ না করিয়া গেরুয়া কাপড় পরিলেই স্বচ্ছন্দে পরের মাথায় হাত বুলাইয়া রাজার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। মনুষ্য, যে সকল স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে চলিতে প্রায় পারিয়া উঠে না, কাহাকেও তাহারই কোন একটা করিতে দেখিলে, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্যে অন্ধ হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। স্ত্রী পরিগ্রহ না করা মানব প্রকৃতির বিরোধী, এবং অত্যন্ত কঠিন, কেহ তাহা করিতে পারিলে, অমনই দেবতা হইয়া গেল, অনেকে আহার না করার ভাণ করিতেও ক্রটী করে না, সেটা হইলেই চরম হইল কি না? যাহা একেবারে অসম্ভব। পঞ্জাবে হরিদাস বাবাজী, ভূকৈলাসের যোগী প্রভৃতির অনাহারে

থাকার কথা শুনা যায়, কিন্তু তাহার বিষয়ে অনেক কথা আছে। তাঁহারা কাহারও দ্বারেও আসেন নাই, কাহাকেও দেখাইতেও চান নাই, বরং আত্মগোপন করিয়া ছিলেন, বলাই যায়। আর তাঁহাদের সঙ্গে তোমার আমার সংশ্রবই বা কি? তার পর, এক একজন একটা হস্ত উর্দ্ধে বাঁধিয়া রাখিয়া শুষ্কপ্রায় করিয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দেয়, আবার তাহাতেই লোকে মোহিত হইয়া বলে, "তুমি পার?" এটা মনে আসে না, যে একজন যখন করিয়াছে, তখন আর একজন পারিবে না কেন? তবে, তাহা করিবে কেন, এই না কথা। একজন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ভয়ে লুকাইয়া একটা অঙ্গ বিকৃত করিয়া সমাজে বাহির হইয়া বলিল, "আমি যোগী সিদ্ধ পুরুষ।" অমনি দলে দলে তাহার পিছু পিছু ছুটিল; এই ত আমাদের দেশের বিচার শক্তি! যে সিদ্ধ পুরুষ, যাহার অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, সে তোমার দ্বারে কেন আসিবে? অনেকে একেবারে প্রকৃত দ্বারস্থ না হইয়া, বৃক্ষতলাদি আশ্রয় করতঃ ক্রমে দ্বারস্থ হন। কেবল দ্বারস্থ হন না, ক্রমে গুরুপদ বাচ্য হইয়া মাথায় উঠেন। এই সকল নিষ্কর্ম্মা লোক যে দরিদ্র ভারতের অন্নধ্বংশ করেন, কেন বল দেখি? না হয় অন্নধ্বংশই করিলেন, যাঁহার আছে, তিনি না হয় অকাতরে দিলেন, কিন্তু ইঁহারা আপন ইচ্ছামত পরামর্শ দিয়া, কৃতকর্ম্মা সংসারী লোক গুলার কার্য্যের ক্ষতি, অর্থনাশ, দেহনাশাদি করিতে থাকেন, তাহার কি? ইহাদের দৃষ্টান্তও বর্জ্জনীয়। কারণ, ইহাদের যদি ইতর মনে কর, তবে আর কোনও কথাই নাই, ইতরের অনুকরণ বড় কেহ করিতে চাহে না। কিন্তু ইহাদের ত ইতর মনে করিতেছ

না, মহৎ মনে করিয়াই শিরোধার্য্য করিতেছ। তখন ইহাদের অনুকরণে যে তোমরাও কর্ম্মত্যাগ করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ "পার্থনমেস্তিকর্ত্তব্যং" ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টই বলিতেছেন, যে তিনি স্বয়ং কর্ম্মশূন্য হইয়াও, লোকের দৃষ্টান্তস্থল হইবার জন্য কর্ম্ম করেন, নচেৎ লোকে তাঁহার অনুকরণে কর্ম্মত্যাগ করিলে সংসার উৎসন্ন যাইবে। যেহেতু, লোকে মহতেরই অনুকরণ করিয়া থাকে; মহতের অনুকরণ করা মনুষ্যের স্বভাব।

সাধারণ লোকে কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, যোগী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া সেই সকল কর্ম্মই করিয়া থাকেন, বুজরুকি করেন না। প্রভেদ কেবল চিত্তের আসক্তি ও অনাসক্তিগত মাত্র। অতএব এ সকল নিষ্কর্ম্মা লোকদিগকে মহৎ কেমন করিয়া বলি? আর ইহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়াও কতদূর সঙ্গত, বুঝিতে পারি না। যাহাদের দৃষ্টান্ত প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ, সংসারের উৎসাদক, তাহারা যদি শীর্ষস্থানীয় হয়, মহৎ হয়, সুতরাং অনুকরণীয় হয়, তবে বলুন, যে সৃষ্টি লোপই ভগবদভিপ্রায়? একথা প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিয়া বুঝিব, না একজন বা দশজন পূর্ব্বোক্ত ভণ্ড তপস্বীর কথায় বিশ্বাস করিব? এত কথা বলার অভিপ্রায় আর কিছুই নহে, যাহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী, প্রকৃত উন্নতির বিরোধী, বরং সমাজের অনিষ্টকর বলিতে পার, এরূপ তামসিক কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, দমনই শ্রেয়ঃ। ভগবদ্গীতাতে ত কর্ম্মহীন ব্যক্তিকেও অন্ততঃ লোক রক্ষার জন্য কর্ম্ম করিতে বলেন। মনুর মত কি?

গৃহস্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ, সকলেই ইহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই গৃহস্থাশ্রম পালনে অসক্ত; ইত্যাদি। (মনু ৩ অধ্যায় ৭৭—৭৯ শ্লোক) ইহা অপেক্ষা আর কি চাই? মনুর মতে গৃহস্থ অন্য আশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তবে ইঁহারা কেন অপেক্ষাকৃত ইতরের উপাসনা বা অনুকরণ করিবেন?

যাক্ বাজে কথার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে, কি কর্ত্তব্য তাহা সদ্বিবেচক মাত্রে বিবেচনা করিয়া দেখেন ইহাই প্রার্থনা। মনুষ্যের ভ্রান্তি পদে পদে, আমি যে ভ্রান্ত হই নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? তবে দশজন সদ্বিবেচকের বিচার দ্বারা মীমাংসিত পথে এবং সরল পথে গমনই সাধারণের পক্ষে শ্রেয়োজনক। এই নিয়মেই সংসার চলে, এবং ইহাই মঙ্গলকর নিয়ম। সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত পথে সর্ব্বতোভাবে চলিলে, সংসার চলে না।

পরিশিষ্ট।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে মূলের স্থানে স্থানে এমন অনেক কথা আছে, যাহা বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণীকৃত না হইলে, সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারে, তজ্জন্য কয়েকটি গুরুতর বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মীমাংসা যথাসাধ্য দেওয়া গেল। প্রমাণ সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক, যে আমাদের শাস্ত্র রত্নাকর স্বরূপ, সকল বিষয়ের প্রমাণই পাওয়া যায়, যে কথাই বল না কেন, ঠিক তাহার বিপরীত কথার প্রমাণ কোথাও না কোথাও পাওয়া যাইতে পারে। সেই না সর্ব্বনাশের মূল। যাহাহউক, এমত স্থলে প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা অগ্রে করিতে হইবে, এবং কোন্ যুক্তি বা প্রমাণ দেশের উন্নত অবস্থার যোগ্য, কোন্‌টি বা অধঃপতনের পরিচায়ক, কোন্‌টি মূল নিয়ম, কোন্‌টি বা গরজে পড়িয়া অপর লোক কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত, সে বিষয়ও একটু ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিষয়টি কঠিন বটে, কিন্তু একেবারে অসাধ্য বলিয়াও বোধ হয় না; আরও, এতদ্ভিন্ন যথার্থ তত্ত্ব উদ্ভাবনের অন্য উপায়ও নাই। আমরা নিম্নে উক্তরূপ প্রমাণ প্রয়োগের চেষ্টাই করিয়াছি। সাপক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক আত্মমত সমর্থন করা উদ্দেশ্য নহে, যথার্থ তত্ত্ব উদ্ভাবন করাই উদ্দেশ্য। প্রমাণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিচার, বাহুল্য ভয়ে এ গ্রন্থে দেওয়া হইল না, পরে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা আছে।

১। আমাদের দেশে প্রায় ব্রাহ্মণ নাই বলা হইয়াছে,

কথাটি গুরুতর সন্দেহ নাই। এই দেশব্যাপী ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি প্রভেদ এখনও সকলে এমন প্রচলিত রহিয়াছে, অথচ ব্রাহ্মণ নাই বলিলে অনেকেরই গায়ে লাগিবে। কিন্তু কি করা যায়, নিম্নে যে প্রমাণ দেওয়া গেল, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকাও দেখা যায় না, এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রভেদ, কিরূপেই বা দেখিতে হইবে, তাহাও বুঝিতে পারি না। নচেৎ আমাদেরই কোন্ ইচ্ছা, যে ব্রাহ্মণত্ব নাই বলিয়া স্বীকার করি। যদি কেহ শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণত্ব আছে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে চিরবাধিত হই। আর নিতান্ত অকারণেও এ বিষয়ের মীমাংসা লইয়া বিব্রত হই নাই। তাহা পরে দেখিবেন।

ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝ? গলায় যজ্ঞোপবীত থাকিলেই যদি ব্রাহ্মণ বুঝিতে, তবে শূদ্র বংশীয় একজন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে, তাহাকে ত ব্রাহ্মণ বল না? ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেও ব্রাহ্মণ হয় না। অনুপনীত ব্রাহ্মণ-তনয়কে কেহ ব্রাহ্মণ বলে না। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া উপনয়নাদি সংস্কার ব্যতিরেকে একগাছা সূত্র ধারণ করিলেও ব্রাহ্মণ হয় না। অনেক শিশু ক্রীড়াচ্ছলেও সূত্র পরিধান করে। তবে ব্রাহ্মণ হয় কিসে? "জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥ শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সবৈঃ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" মনু ২য় অধ্যায়ে উপনয়ন সংস্কারাদি বিষয়ে বলিয়াছেন, যে যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত, পবিত্রস্বভাব, বেদাধ্যয়নযুক্ত, ষট্কর্ম্মরত সর্ব্বদা শৌচাচার পরায়ণ, অতিথি ও ভৃত্যাদির ভোজনান্তে

আহারকারী, গুরুপ্রিয়, নিয়মশীল, সত্যবান্ তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার প্রথমেই সংস্কারের কথা আছে। সংস্কার ব্যতীত ব্রাহ্মণ হইবেই না। তাহার পর অন্যান্য গুণের আবশ্যক। এক্ষণে দেখুন, সংস্কার কি কি, এবং কাহার কত দূর হয়, তৎপরে অন্য বিষয় বিচার্য্য।

ব্রাহ্মণের দশবিধ সংস্কার; তন্মধ্যে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন, ব্রাহ্মণ হওয়ার পর হইবে বলিয়া, ঐ চারিটিকে ছাড়িয়া একেবারে জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়াছেন; কারণ, "রেতো রক্ত গর্ভোপঘাতঃ পঞ্চগুণো জাতকর্ম্মণা প্রথমমপোহতি।" সুতরাং প্রথমে জাতকর্ম্ম, পরে নাম করণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, তাহার পর উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস করতঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া যথাকালে সমাবর্ত্তন। এক্ষণে ইহার কাল নির্দ্দেশ; (মনু ২য় অধ্যায়) "প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্মবিধীয়তে। মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাং॥ ২৯। নামধেয়ং দশম্যাং তু দ্বাদশ্যাং বাস্যকারয়েৎ। *। ৩০। চতুর্থেমাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রামণং গৃহাৎ। ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে"॥ ৩৪। ইহা কাহার কতদূর বিধিপূর্ব্বক হয়, বলিতে পারি না, অনেক স্থলে হয় না, জানি। সে বিষয়ে বৃথা বাগ্বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, তাহার পর "চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ। প্রথমেহব্দে তৃতীয়েবা কর্ত্তব্যং শ্রুতিবেদনাৎ"। ৩৫। এই চূড়াকর্ম্ম প্রায়ই ত উপনয়নের সঙ্গে হইতে দেখা যায়; তাহা হউক, তাহাতে ব্রাহ্মণত্বের বিঘ্ন না থাকিতে পারে। কিন্তু মূল কথা, উপনয়ন সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। নচেৎ বেদে অধিকার হয় না, শূদ্রের সমানই থাকে। "নাভিব্যাহারয়েদ্ব্রহ্ম স্বধানি নয়নাদৃতে। শূদ্রেন

হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদো ন জায়তে ॥” ১৭২। উপনয়ন শব্দে গুরুগৃহে লইয়া যাওয়া, সেই গুরুগৃহে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অভাব পক্ষে ৯ বৎসর হইতে ৩৬ অথবা তদধিক কাল যাবৎ ত্রিবেদ, দ্বিবেদ, অন্ততঃ একবেদ অধ্যয়ন করতঃ, “ষট্ ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং। তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা” ইত্যাদি। (৩ অধ্যায় ১-২ শ্লোক)। পরে, “গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবর্ত্তো যথাবিধি। উদ্বহেতো দ্বিজো” ইত্যাদি (২, ৩ অধ্যায়)।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনুর নিয়মই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কলি কালের মান্য শাস্ত্র পরাশর সংহিতাতেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্বন্ধে কোন রূপ অন্য নিয়ম করেন নাই; করিতে পারেনও না। সুতরাং, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না, যে অক্ষম পক্ষে কলিকালে আমরা যে প্রণালীতে ব্রাহ্মণ হইয়া আসিতেছি, তদ্দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে। তৎসম্বন্ধে অক্ষম পক্ষের ব্যবস্থা চলিবে না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কিছু সোজা কথা নহে, যে একেবারে ফাঁকিতে চলিবে। তিন বেদের স্থলে, না হয় এক বেদ পড়, ৩৬ বৎসরের স্থলে না হয় ৯ বৎসর কর, কিন্তু পুকুর চুরি চলে না।

যে সময়ে কলিকালের জন্য ভিন্ন লিখিবার আবশ্যকতা ছিল না, এমত সময়ে লিখিত, মহাভারতেও বলিতেছেন, যে “বেদাধ্যয়ন, ব্রত ও উপবাস দ্বারা পরমায়ুর প্রথম ভাগ (অর্থাৎ ২৫ বৎসর) গত হইলে, গুরুকে দক্ষিণা দান পূর্ব্বক যথাবিধি সমাবৃত্ত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।” (শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম প্রং ২৪১ অ,) এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে আমরা যাহাকে উপনয়ন বলি, তাহা, গুরুগৃহে গমন জন্য পিতার, গুরুর,

ও বালকের যে সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অঙ্গীকারাদি আবশ্যক, তাহাই তিন কথায় সারিয়া ধার কত গায়ত্রী পাঠ করতঃ সমাবর্ত্তন হওয়া মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাকে উপনয়ন বলে, তাহার কিছুই হইল না, উপনয়নের অনুষ্ঠান হইয়াই শেষ। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া, বা বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ করা দূরে থাকুক, সংস্কার দ্বারা শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া দ্বিজ পদ বাচ্য হইবারও অপেক্ষা রহিল না। যে শূদ্র, সেই শূদ্রই থাকিয়া গেলেন। ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম পালন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নের কথাই ত নাই। সেখানে গমন পর্য্যন্তই হইল না। তিন পদ গমন, তিন বার গায়ত্রী, আর বশ্, ব্রাহ্মণ হইয়া গেল। যখন গুরুগৃহে গমনই হইল না, তখন আবার সমাবর্ত্তন কিসের? সুতরাং সমাবর্ত্তনটাও কিছুই নয়। উপনয়নের মন্ত্র পড়ান হইল, সংকল্প করাইয়া পতিত করা হইল, কিন্তু উপনয়ন হইল না। যদি বল, যে আচার্য্য ত গায়ত্রী পড়াইলেন, কিন্তু তাহাতে উপনয়ন হয় না। উপনয়ন অর্থেই লইয়া যাওয়া, অর্থাৎ গুরু গৃহে, এবং সমাবর্ত্তন অর্থে, তথা হইতে ফিরাইয়া আনা, এই দুইটি অঙ্গ বিশেষ নহে, মূল সংস্কারই এই দুইটি; বরং যে কয়েকটা মন্ত্র পড়ান হয়, তাহাকে অঙ্গ বিশেষ বলা যায়। তাহার পর, গুরু আর আচার্য্যে অনেক প্রভেদ, গুরু পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আচার্য্য পিতা অপেক্ষা অনেক লঘু, অতএব আচার্য্যের গায়ত্রী পড়ানতে গুরূপদেশ হয় না। সকল বচন উদ্ধৃত করায় পুঁথি বাড়ে (মনু ২অ)। সংস্কার দ্বারা জাত্যন্তর হয় বলিয়াই দ্বিজাতি নাম।

এই ত গেল সংস্কারের কথা। তাহার পর শুচি অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বভাবের কথা, শৌচাচার নহে, সে কথা পরে স্বতন্ত্র আছে।

ব্রাহ্মণোচিত বিশুদ্ধ স্বভাব, শতকরায় কায নাই, সহস্র কি লক্ষে কয়টি পাওয়া যায়, জানি না।

তাহার পর বেদাধ্যয়ন; সে কথায় আর কায নাই; থাকুক। গায়ত্রীও অনেক ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করিতে পারে না।

তৎপরে ষট্‌কর্ম্ম, "অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। মনু (১-২৭)। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়া; এক সময়ে যাহাকে হউক, একবার পড়ান; আর দান ও প্রতিগ্রহ, কাহার না আছে? যজন যাজন ত ভট্টাচার্য্যের কার্য্য। পরাশর আবার আর এক রকম ষট্‌কর্ম্মের ফর্দ্দ দিয়াছেন। "সন্ধ্যাস্নান জপোহোমঃ স্বাধ্যায়োদেবতার্চ্চনম্। বৈশ্বদেবাতিথেয়ঞ্চ ষট্ কর্ম্মাণি দিনে দিনে। (পারাশর ১অ, ৩৮।) কেবল তাহাই নহে, বৈশ্যোচিত কৃষিকর্ম্মও ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা; এবং ভিক্ষোপজীবিকা নিবারণ করিয়াছেন (৩৮ শ্লোক ও ২অ, ২য় শ্লোক) এ প্রথা নিন্দনীয় নহে, অন্ততঃ আমরা কলি কালের লোক, আমাদের লাগে ভাল। তাই "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ"। যাহাহউক, এ সকলও প্রায় দেখা যায় না।

তাহার পর সংক্ষেপে সারা যাউক। শৌচাচার পারায়ণ, বিঘসাশী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যরত, সে ত কত? "ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বান্ নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমান্। সশূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মনঃ।" প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা না করিলে শূদ্রবৎ ত্যজ্য। তা কেহ কেহ করেন বটে, কিন্তু দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হইয়া, এবং সন্ধ্যায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের কথা আছে, কি ফলাহারের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত আছে, প্রায়ই সে বিষয়ের ভালরূপ তত্ত্ব না লইয়াই করিয়া থাকেন। অধ্যবসায় বটে।

ব্রাহ্মণের অন্যান্য নিয়ম, কূর্ম্ম পুরাণ, উপবিভাগ ১৪ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির মতে যে সকল নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে সত্যপালন ও মিথ্যাপরিহার; সর্ব্ববিক্রয়, চৌর্য্য, পরদার প্রভৃতিতে রত না হওয়া, ইত্যাদি। আর আর নিয়মের মধ্যে যে চারিটির উল্লেখ করিলাম, তাহাতেই বুঝিয়া লউন, যে আর সব ছাড়িয়া দিলেও, ব্রাহ্মণত্ব কয়জনের আছে।

পুরাণ সংহিতাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ মতে, আমরা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ নহি, ব্রাহ্মণত্বের কোনও দাবীই করিতে পারিনা। তাহার পর, যথার্থতঃ যাহাকে ব্রাহ্মণ বলে, যে রূপ লোক সেই রূপ ব্রাহ্মণ হইবার প্রকৃত উপযোগী, তাহার পরিচয় দিলে ভাল হয় না? ভগবদ্গীতায় বলিতেছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া স্বষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ"। ৪অ, ১৩ শ্লোক। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ ক্রমে চতুর্ব্বর্ণ স্বষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, সত্ব গুণ প্রধান হইবেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক কর্ম্ম "শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজং।" ১৮অ, ৪২ শ্লোক। অতএব, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির দাবি করা যাইতে পারে না। ফল কথা, যিনি যত কিছু জোর করিয়া বলুন না কেন, ব্রাহ্মণ যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা নিশ্চয়। তবে এখন যদি কেহ একখান হালের শাস্ত্র রচনা করিয়া ফেলিতে পারেন, এবং তাহাতে এরূপ লেখা থাকে, যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম, এবং দাড়ি গোঁফ উঠিবার পূর্ব্বে একবার মস্তক মুণ্ডন করতঃ, কিয়ৎক্ষণের জন্য রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া, গলদেশে একগাছ সূত্র ধারণ করাই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার পর একটা টিকী রাখা

এবং যে কোনও সময়ে হউক, প্রত্যহ একটা করিয়া ফোঁটা কাটা, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয়; তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় বড় সুবিধা হয়।

এ বিষয়ে আর বৃথা কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই। তাহার পর ব্রাহ্মণীর একাদশীর উপবাস। ব্রাহ্মণ নাই তার ব্রাহ্মণী! তা সহধর্ম্মিণী ব্রাহ্মণীগণ ছাড়িবেন কেন? তোমরা শূদ্র হও আর যাই হও, তাঁহারা ব্রাহ্মণী, সুতরাং একাদশী করিবেন। তা করুন, যখন এদেশে জন্মিয়াছেন, তখন তাই বটে।

একাদশীর উপবাস প্রশংসা অনেক স্থলেই করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অন্য কথা বলিতেছি না। যখন শাস্ত্রের কথা হইতেছে, তখন তাহাই হউক। একাদশীতে নিরম্বু উপবাসটা বিধবার যেমন একচেটে হইয়া উঠিয়াছে, আর ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়া নিজে পেট ভরিয়া কেহ ফল মূল, কেহ বা অন্য প্রকার আহার করিয়া থাকেন, সেরূপ ব্যবস্থা ত কোনও স্থানে পাওয়া যায় না। ‘অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।” (কাত্যায়ন)। নবম বৎসর হইতে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সকলেই একাদশী করিবেন। ব্যবস্থা ত সমান, কার্য্যে কিন্তু কেবল বিধবারই পক্ষে, তা অশীতি অতিক্রম করিলেও রেহাই নাই। এ পক্ষে, পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে আরও স্পষ্ট লিখিয়াছেন, “বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চবরবর্ণিনি। একাদশ্যুপবাসস্ত কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়।” সকলেরই সমান কর্ত্তব্য, অথচ আর কেহ করুক না করুক, বিধবারা করিবে, তাহাদের মৃত্যু শীঘ্র বাঞ্ছনীয়।

কেবল একাদশী কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৮৩ অধ্যায়ে ত আরও অনেক কথা বিধবার অবশ্য পালনীয় বলিয়া লেখা আছে। তন্মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েকটা বলি, বিধবার পক্ষে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি নিষিদ্ধ, যথা;—দিব্য বস্ত্র, গন্ধ দ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, এবং তৈল মর্দ্দন, মিষ্টান্ন ভোজন, বিভব ভোগ, তাম্বুল, রক্তশাক, মসূর, জম্বীর ও বর্ত্তুলাকার অলাবু পর্য্যন্ত ভক্ষণ, পর্য্যঙ্কে শয়ন, যানারোহণ, কেশ ও গাত্র সংস্কার, পর পুরুষের মুখদর্শন, সুবেশ পুরুষ দর্শন, যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, এমন কি, নর্ত্তক গায়ক পর্য্যন্ত দর্শন নিষেধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ গুলি সব না মানিয়া, কেবল একাদশীটা লইয়াই এত পীড়াপীড়ি কেন? সকল গুলির স্থলে একে হতাদর যদি উপেক্ষণীয় হয়, অপরটিতেও না হইবার কারণ কি?

ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন, যে "অশাস্ত্র বিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ। দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ। কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থংভূতগ্রামমচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্"। (১৭ অ ৫।৬ শ্লোক) তা আমাদের বিধবাদেরও আচরণ এইরূপ বৈ আর কি বলিবে? স্বর্গাদি ভোগ কামনা (পরাশর সংহিতা ৪ অ ২৮। ২৯ শ্লোক), অথবা লোক লজ্জায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে শরীরকে যেরূপ ভয়ানক ক্লেশ দেওয়া হয়, তদপেক্ষা আর কে কি ঘোর কার্য্য করে? অথচ এই ব্রহ্মচর্য্য করিতে গিয়া, কে না মিথ্যাচার দোষে দুষ্ট হন? (গীতা ৩ অ, ৬ শ্লোক) আত্মপীড়ার জন্য যে তপঃ তাহা তামসিক। (১৭ অ ১৯ শ্লোক) শেষ কথা, অসক্ত স্থলে প্রতিনিধি চলে, "উপবাসেত্বশক্তস্য আহিতাগ্নেরথাপিবা। পুত্রান্

কারয়েদন্যান্ ব্রাহ্মণান্ বাপিকারয়েৎ। অথবা বিপ্রমুখ্যেভ্যো-দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ।” (বায়ু পুরাণ) অথচ তোমরা জলাভাবে মরিতে দেখিয়াও এক ফোঁটা জল ত দাওনা! অকারণে বলি নাই, যে তোমরা শাস্ত্র মান না। শাস্ত্র দেখিবে না, তা মানিবে কি? তার উপর স্বার্থপরতা। আর শাস্ত্রের দুরবস্থার বিষয়ও স্থানান্তরে বলিবার ইচ্ছা আছে।

পৃথিবীর সমস্ত জাতিই উন্নতির দিকে ধাবমান, কেবল পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিয়ম অতিক্রম পূর্ব্বক আমরাই পূর্ব্বপ্রথা, (অর্থাৎ যে সময়ে ভারত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সে সময়ের প্রথা নহে, যাহাতে অধঃপতন হইতেছে বা হইয়াছে, সেই প্রথা,) কিরূপে ফিরিয়া আইসে, তাহারই চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ করিতেছি। সময়ের শ্রোতের বিরুদ্ধে, ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে কৃত সংকল্প হইতেছি। যাহা হইবার নহে, তাহাই করিব। সংসারের ইহা একটি সুনিশ্চিত নিয়ম, যে, কোনও অবস্থাই অচলভাবে থাকিতে পারে না, হয় উন্নতি, না হয় অধোগতি হইতে থাকিবেই থাকিবে। এই পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আর শিখিব না বলিলে, পূর্ব্ব বিদ্যা ক্রমে লোপ হইতে থাকিবেই, তাহা ঠিক রক্ষা করিয়া চলা যায় না। সকল বিষয়েই এই নিয়ম প্রত্যক্ষ হয়। আমাদের শাস্ত্রে যাহা আছে, আর তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তাহা অভ্রান্ত এবং অপরিবর্ত্তনীয়, এই এক ধারণাতেই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যদি অভ্রান্ত বল, তাহা হইলে, স্পষ্ট বিরুদ্ধ মত সকলের সঙ্গতি হয় কিরূপে? যদি বল, দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন মত অবলম্বনীয়, তবে আর অপরিবর্ত্তনীয়ও

বলা যায় না। এ বিষয়ে অনেক গুরুতর কথা আছে। এস্থলে আর না।

সর্ব্বশেষে আর এক কথা বলি, আমাদের মন্বাদি শাস্ত্রমতে বিলাত গমনে দোষ ত দেখিতে পাই না। অবশ্য, ব্রাহ্মণদের বাসোপযোগী কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার পর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বাসযোগ্য স্থান নির্ণয় করতঃ (২অ, ২৪) লিখিতেছেন, "এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ। শূদ্রস্তুযস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্ষিতঃ।

এক্ষণে কথা হইতেছে, যে ব্রাহ্মণ থাকুক বা না থাকুক, সে কথা লইয়া এত আন্দোলনের প্রয়োজন কি ছিল, তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণীর পক্ষে একাদশীর ব্যবস্থা অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীপুরুষ অপেক্ষা পৃথক্ হইতে পারে না; ব্রাহ্মণত্বের অভাব বহুকাল হইতে পরিদৃষ্ট। তাহা হইলে ব্রাহ্মণীরও অভাব।

দ্বিতীয়তঃ, যে শূদ্র, অথবা শূদ্রবদাচারে ব্রাহ্মণত্বে হীন, সে কেন না অর্থোপার্জনার্থ সকল দেশে যাইতে পারিবে? যে ব্রাহ্মণ, সে কেনই বা বিদেশে যাইবে? তাহার প্রয়োজন কি? সে গৃহে বসিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষালব্ধ ধনে সন্তুষ্ট থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করিয়া দিনপাত করিবে। কিন্তু যে অর্থলোভে দাসত্ব স্বীকার করিবে, সে, যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক, যতই সন্ধ্যা আহ্নিক করুক বা তিলক কাটুক, তাহার যতই কেননা সংস্কারাদি সুসম্পন্ন হউক, সে শূদ্রভাবাপন্ন, তাহাতে সংশয় কি? "পরিচর্য্যাত্মকঙ্কার্য্যং শূদ্রকর্ম্ম স্বভাবজং" (গীতা) তবে সে কেন সর্ব্বত্র গমন বা বাস পর্য্যন্ত করিতে

না পারিবে? যদি বল, সে শূদ্র হইলে তাহার সহিত চলিতে পার না; অবশ্য, তোমার ব্রাহ্মণত্ব থাকা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে বটে, তাহা অপেক্ষা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলে ত আর সে কথা চলে না। এখনও পতিত হইবার ভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইংরেজের চাকুরী স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহা হইলেই সব হইল না কি? পূর্ব্ব মীমাংসা অনুসারে তোমরা সংস্কার বর্জ্জিত। তবে বিদেশ গমনে আপত্তি কাহার? যাঁহারা ইংরেজের চাকুরী করেন, আর—অধিক কথায় কায নাই,—স্থূল কথা, যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে বিশেষ শূদ্রভাবাপন্ন, তাঁহাদেরই ত বিশেষ আপত্তি দেখা যায়। এই জন্যই ত বলি, আমরা বড় লোক কি না? আমরা অত্যন্ত বড় লোক, আমাদের এ গৌরব যাহাতে কিছুতে না যায়, তাহা সর্ব্বোতোভাবে করা কর্ত্তব্য। পৃথিবীশুদ্ধ লোকে আমাদের কেমন বড় চক্ষে দেখে! আর অন্যে যে চক্ষেই দেখুক না কেন, আমরা ত জানি যে আমরা বড়, তাহা হইলেই হইল। গ্রামশুদ্ধ লোক যাহার নিন্দা করে, সে অবশ্য মনে মনে জানে, যে সে নির্দ্দোষী, আর গ্রামের লোক গুলা পাজী। আবার তাহার যদি বড় বংশে জন্ম হয়, তবে ত আরও গৌরব। গ্রামের লোক যত বলে, "এত বড় বংশে জন্মিয়া লোকটার কি হীন স্বভাব? ততই তাহার গৌরব বৃদ্ধি পায়। আমাদেরও ঠিক তাই।

এখন যাঁহারা হিন্দুয়ানীর পুনরাবর্ত্তনের দল গঠিতেছেন, অর্থাৎ যাঁহাদের revival এর দল বলা গিয়াছে, যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্র আদৌ পড়েন নাই, না হয়, দুই একটা কথা এক স্থানের ভাল শুনিয়া, নিজ বিদ্যা বলে এক রকম গড়িয়া দাঁড় করাইয়াছেন

তাঁহাদের নিকট এই ভিক্ষা, যে তাঁহারা যেমন অন্যান্য বিদ্যায় বিশারদ, তেমনই যদি ভাল করিয়া একবার স্থির চিত্তে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসা করেন, তবেই ভাল দেখায় না? মহাত্মা রাম মোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিরা কেহই শাস্ত্র সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যে, বা বুদ্ধিতে সামান্য লোক ছিলেন না, অথবা দেশ হিতের জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থও দেখা যায় না, তাদৃশ বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ মহোদয়েরা সকলেই একবাক্যে যে সকল দেশহিতকর, অথবা সমাজের কল্যানকর কথা বলেন, সে সকল কথা উড়াইয়া দেওয়াটা যদিও আমাদেরই দেশে সাজে, তথাপি তাহা কি করা উচিত? একটা কথা বলিবার পূর্ব্বে ভাল মন্দ বিচার করিয়া বলা আবশ্যক। নচেৎ মূর্খতা প্রকাশ পায়। আর বিচার করিতে হইলে, বিদ্যা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য্য, নিঃস্বার্থতা ও পক্ষপাতশূন্যতার আবশ্যক। নচেৎ বিচার করা যায় না।

এক্ষণে, সাধারণে স্থিরচিত্তে উপস্থিত বিষয়ের শুভাশুভের বিচার করেন, ইহাই প্রার্থনা। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে একটা নূতন কথা প্রায়ই বিরাগের কারণ হইয়া থাকে; তা বলিয়া সকল কথা একেবারে অগ্রাহ্য করা, বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।